
ফাল্গুন
১৩৬৭

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—সত্য গুপ্ত ; ভারতীয় ; ২৯ নর্থ রেঞ্জ ; কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক— " " " " "

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার ; ভারতীয়
(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয়
২৬।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্‌ডিংস্, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৩৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলকাতা-৪ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-১৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-২৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলকাতা-১৯ ॥

১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন রায়, ১০৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬॥

পরিচয়

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা

পরিচয়-এ লেখা রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে খ্যাতনামা মনীষীদের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে পঁচিশে বৈশাখ প্রকাশিত হবে।

এজেন্ট, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের প্রতি নিবেদন: চাহিদা জানিয়ে অগ্রিম অর্ডার বুক করুন।

কার্যাধ্যক্ষ
পরিচয়

সূচীপত্র

ফাল্গুন সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
৩০ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৮৮২ : ১৩৬৭

ল্যেফ তলস্তোই-এর সাহিত্য-সাধনা

নীরেন্দ্রনাথ রায়

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কথা বলিতে গেলে যাঁহাদের নাম স্বতঃই সর্বাগ্রে স্মরণে আগে, বোধ হয় অকুণ্ঠে ঘোষণা করা যায় যে ল্যেফ তলস্তোই তাঁহাদের অন্যতম। বিশেষতঃ আধুনিক অর্থাৎ মধ্যযুগ-পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই অভিমতও হয়তো অসঙ্গত নয় যে তিনি কেবল ইতালীর দান্তে ও ইংলণ্ডের শেক্সপীয়রের সহিত-ই তুলিত হইবার যোগ্য। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের তুলনামূলক মাপকাঠি খুবই অনিশ্চিত। সাহিত্যের প্রকাশ-মাধ্যম হইল ভাষা। ভাষার ব্যবহারে কোন লেখকের কতখানি কৃতিত্ব, তাহার উপরে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে পদের প্রয়োগে, শব্দের যোজনায় ও নানাবিধ প্রকরণের উদ্ভাবনে রচনাশিল্পী হিসাবে সাহিত্যিক খুঁজিয়া পান ব্যক্তিগত প্রতিভার স্বধর্ম-অনুমোদিত প্রদর্শনক্ষেত্র। কিন্তু রচনাশিল্পের চরম সার্থকতা প্রদর্শনে নয়, প্রকাশে। সাহিত্যরচনায় শাব্দিক অর্থ ও আনুষঙ্গিক দ্যোতনার ভিতর দিয়া যাহা পাঠককে তত্ত্বশিক্ষার বা রসাস্বাদনের অতিরিক্ত সাবেগ অনুভূতির প্রগাঢ়তায় অভিভূত করিয়া ফেলে তাহাকেই বলা চলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রাণবস্তু। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক লংগিনাস্-এর উক্তি : "সাহিত্য কেবল শিক্ষা দেয় না, সরস করে না, বিচলিত করে।" ইহারই প্রভাবে বৃহৎ সাহিত্য ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া সর্বমানবীয় হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্যের এই প্রাণবস্তুর উৎসের সন্ধান শক্তিশালী সাহিত্যিক পান তাঁহার সমকালীন ঐতিহাসিক পরিবেশে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই দেখা যায় পৃথিবীর যে কোন দেশে ও যে কোন কালে বৃহৎ সাহিত্যের আবির্ভাব হয়

না। যে-দেশে ও যে-কালে সমাজজীবনে গভীরতর আলোড়ন সংঘটিত হয় তখনই কেবল সম্ভব হয় সেখানে বৃহৎ সাহিত্যের উদ্ভাবনা। দান্তের যুগের ইতালীতে ও শেক্সপীয়রের যুগের ইংলণ্ডে সামাজিক আলোড়ন বিশ্বমানবের প্রগতির ইতিহাসে দুইটি গৌরবময় অধ্যায়। ইহার পরে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও বিপুল সামাজিক আলোড়ন ঘটিয়াছিল ও তাহার ফলে সেই সব দেশেও সৃষ্টি হইয়াছিল মহৎ সাহিত্যের। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে এইসব দেশে সমাজ-বিপ্লবের সীমারেখা ইংলণ্ডীয় সমাজ-বিপ্লবের সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তাই দেখা যায় উত্তর-শেক্সপীয়রীয় যুগের ফরাসী, জার্মান, বা নরওয়েজীয় সাহিত্য তাহাদের বিপুল মানবীয় সংবেদনশীলতা সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের তুলনায় স্তিমিতজ্যোতি। জারতন্ত্রীয় রুশদেশের যে সামাজিক পরিবেশে ল্যেফ তলস্তোই-এর প্রতিভার উদ্ভব ও বিকাশ তাহার উপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অসামান্য ; কিন্তু ইতিহাসের নিগূঢ় ইঙ্গিতে তাহাতে নিহিত ছিল সমগ্র মানবসমাজের নূতন অগ্রগতির সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ সমাজবিন্যাসের বীজ। তলস্তোই-এর উর্বর মানসক্ষেত্রে এই বীজ হইতে ফলিল অভাবিতপূর্ব ফসল, তাঁহার রচনাসম্ভার। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মহিমায় রুশসাহিত্য তর্কাতীতভাবে বিশ্বসাহিত্যের পুরোভাগে আসিয়া সম্মানের আসন অলংকৃত করিল।

ইহা আজ সুবিদিত যে রাশিয়ার জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় পুশ্‌কিনের প্রতিভার মাধ্যমে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল তাঁহার অকালমৃত্যু মাত্র ৩৯ বছর বয়সে, যাহাকে মৃত্যু না বলিয়া হত্যা বলাই বেশী যুক্তিসঙ্গত, কারণ এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে প্রধান নায়ক ছিলেন স্বয়ং জার প্রথম নিকলাই। আবাল্য পুশকিনের রচনার ও ব্যক্তিত্বের প্রবল অনুরাগী শিশু ল্যেফ তলস্তোই-এর বয়স তখন নয়-দশ বৎসর (জন্ম, ১৮২৮) ; ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে পুশকিনের আয়ুষ্কাল স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ৮২ বছর বয়সে বিশ্বপূজ্য সাহিত্যগুরুর জীবন শেষ হইল স্বেচ্ছাকৃত প্রায়-অপঘাতে, তখন প্রথম রুশ-বিপ্লবের পর গোর্কী-র "মা" ও লেনিনের "মেটিরিয়ালিজম ও এম্‌পিরিয়ো-ক্রিটিসিজম্‌" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থ দুইটি পাঠকসমাজে আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক পর্ব তলস্তোয়ীয় সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট। তলস্তোই-এর রচনাবলী তাঁহার জীবনব্যাপী সমকালীন সামাজিক চেতনার সহিত ওতপ্রোতভাবে সমপৃক্ত। তিনি একদিকে যেমন আজন্মলেখক অন্যদিকে আমরণ-লেখক।

তলস্তোই-এর প্রথম রচনা প্রকাশ্যে দেখা দেয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চব্বিশ বছর বয়সে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ,—"শৈশব"। ইহা ঠিক লেখকের তথ্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী নয়, বাল্যস্মৃতির অবলম্বনে একটি পর্যবেক্ষণশীল ও সংবেদনশীল চিত্তের আত্মপ্রকাশ। শিশু ল্যেফ-এর সাহিত্য-চর্চা পারিবারিক পরিবেশে ছিল সস্মিত পরিহাসের বিষয়, "ক্ষুদে মলিয়ের" "ছোকরা দার্শনিক" ইত্যাদি ছিল তার বিভূষণ। কিন্তু প্রাণের মিল ছিল বড়-দাদার সহিত। তাঁহার সহিত গোপন পরামর্শের পর "শৈশব" প্রেরিত হয় "সোভ্রেমেন্‌নিক" (সমসাময়িক) পত্রিকার সম্পাদক কবি নেক্রাসফ্-এর নিকট পত্রযোগে। নামের পরিবর্তে লেখক ব্যবহার করিয়াছিলেন দুটি আদ্যাক্ষর, এল, এন, অর্থাৎ ল্যেফ নিকলায়েভিচ। রুশ সাহিত্যজগতে তখন এই পত্রিকার ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। তাহার পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়া তখন যে কোন লেখকের পক্ষ গৌরবের বিষয়। সোভ্রেমেন্‌নিক-এর পরিচালকেরা মুগ্ধ হইয়া গেলেন এই অজ্ঞাত লেখকের রচনায়। তাহাতে ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় অসামান্য কবিত্ব, ও সেই সঙ্গে সামাজিক ন্যায়-মূল্যের উদ্দীপ্ত চেতনা। অভিজাত বংশে জন্মিয়াও ভূমিদাসদের জন্য সমবেদনা যেমন লক্ষণীয়, তেমনই লক্ষণীয় ফরাসী শিক্ষকের অভদ্র আচরণের বিরুদ্ধে অনমনীয় প্রতিবাদ। সম্পাদক নেক্রাসফ্ অবিলম্বে লিখিয়া পাঠাইলেন —সাহিত্যাঙ্গনে আপনি নন আগন্তুক অতিথি।

যে আত্মস্মৃতি রচনার সূচনা হয় "শৈশবে", তাহা পরে, প্রসারিত হয় "কৈশোরে" ও "যৌবনে"। কিন্তু 'সোভ্রেমেন্‌নিক'-এ গার্হস্থ্যচিত্র "শৈশবে"র পরই প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের একটি চিত্র "হঠাৎ আক্রমণ।" ইহাতে আছে ককেসাস প্রদেশের বন্যপ্রকৃতির বর্ণনা ও তথাকার আদিম জাতির উদ্দাম জীবনযাত্রার ও মৃত্যুভয়হীন বীরত্বের কাহিনী। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আমন্ত্রণে এই প্রদেশে অবস্থান ও ভ্রমণের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল এই রোমান্স-ধর্মী খণ্ড-কাব্য। ইহা পড়িয়া নেক্রাসফ এক পত্রে তুর্গেনিয়েফ-কে জানাইয়াছিলেন—"এমন জিনিস ইতিপূর্বে রুশসাহিত্যে দেখা যায় নাই।"

ভাবিতে পুলক লাগে যে রুশ-সাহিত্যে প্রবেশের পথে তলস্তোই-এর প্রথম দুই পদক্ষেপ হইল শান্তি ও যুদ্ধের চিত্রায়নে। প্রাকৃতিক শান্তির সহিত তলস্তোই-এর পরিচয় আজন্ম, পৈতৃক নিবাস 'ইয়াস্নায়া পলিয়ানা'-র মনোরম পরিবেশ তাঁহাকে চিরজীবন মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে, (১৮৫৪-৫৬)। যৌবনের আবেগে তলস্তোই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন স্বেচ্ছায়, ব্যক্তিগত সাহসিকতায় বীরের সম্মানও পাইয়াছিলেন কিন্তু রুশজাতির ভাগ্যে ঘটিল পরাজয়। এইখানেই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। সামরিক জীবনে তাঁহার আসিল অতৃপ্তি, কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়া ফেলিলেন কয়েকটি গল্প —'সেভাস্তোপল-এর গল্প' নামে যাহারা এখন প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের কাহিনী হইলেও এগুলিতে নাই বীরত্বের গাথা। বিশ্বসাহিত্যে এই প্রথম স্থান পাইল যুদ্ধের বাস্তবতা যাহার অকপট প্রকাশ—'রক্তক্ষয়ে, আর্তনাদে ও গণহত্যায়'। এই ব্যাপক ভীষণতার ভিতরেও তলস্তোই ভুলিয়া যান নাই প্রকৃত বীরত্বের মানবিক মূল্য। বিশ্বসাহিত্যে তিনিই প্রথম দিলেন সমসাময়িক সাধারণ সৈনিকের নৈতিক মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। গল্পগুলি সোভ্রেমেন্নিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকমহলে সাড়া পড়িয়া গেল। নেক্রাসফ বলিলেন, এই লেখক শিকারী পাখি, হয়তো বা একেবারে ঈগল। তুর্গেনিয়েফ লিখিয়া জানাইলেন—আপনার উপযুক্ত অস্ত্র অসি নয়, লেখনী। তলস্তোই সানন্দচিত্তে অসিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন পিটার্সবুর্গে, মিলিত হইলেন সোভ্রেমেন্নিকের লেখকমণ্ডলীর সহিত। যাহাদের নাম এতদিন শোনা ছিল এখন তাহাদের সহিত হইল চাক্ষুষ পরিচয়। তাঁহার রচনাগুলি দ্রুত প্রকাশিত হইতে লাগিল এই বিখ্যাত পত্রিকায়। সমালোচকশ্রেষ্ঠ চের্নিশিয়েভস্কি তলস্তোই-এর প্রারম্ভিক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির বিশ্লেষণ করিয়া লিখিলেন এই মর্মে, যে এই ভাগ্য-পুরস্কৃত লেখকের আছে মানসলোকের সূক্ষ্মতম আন্দোলন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও তাহাকে রূপায়িত করার দুর্লভ ক্ষমতা। তিনি ধরিতে পারেন যাহা মানুষের অন্তরে মাত্র সঞ্চরমান, তাহাদের নানা রূপ, বিভিন্ন গতিবিধি। মানবমনের দ্বান্দ্বিকতা তাঁহার আয়ত্তে। আরও একটি বিশেষ লক্ষণের দিকে তিনি তখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—লেখক হিসাবে তলস্তোই-এর নৈতিক অনুভূতির শুচিতা। বলা বাহুল্য, চের্নিশিয়েভস্কির এই বিশ্লেষণ তলস্তোই-এর পরিণততম জীবনের রচনার সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য।

তলস্তোই পিটার্সবুর্গে আসায় সোভ্রেমেন্নিক-গোষ্ঠীর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এইরূপ আত্যন্তিক গুণানুরাগ সত্ত্বেও তাঁহাদের ঘটিয়া গেল মৌলিক মতভেদ। যাহাকে বলা হয় বিশুদ্ধ আর্ট, তাহার বিরুদ্ধে দুই পক্ষেরই ছিল তীব্র বিরোধিতা। কিন্তু সোভ্রেমেননিক গোষ্ঠী "বিপ্লবী গণবাদী", আর কোনরূপ বিপ্লবী পন্থায় আস্থা ছিল না ল্যেফ তলস্তোই-এর। প্রীতির সম্পর্কে পড়িল ছেদ, বিশেষ করিয়া তুর্গেনিয়েফ-এর সহিত। তলস্তোই শহর ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিলেন গ্রামে, পিটার্সবুর্গ হইতে ইয়াস্নায়া পলিয়ানায়। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এই অঞ্চলের জমিদারি বাছিয়া নিয়াছিলেন তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতিমণ্ডিত আবাস ভবনটি সমেত। এখন হইতে এই স্থান হইল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। মাঝেমাঝে মস্কো বা অন্যত্র যাইতে হইয়াছে। তিনি দুই বার ইউরোপের নানা দেশে পর্যটন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে কিছুকাল মস্কোতে বসবাসও করিতে হইয়াছিল, সেখানেও আছে তাঁর বাসস্থান, যাহা এখন মিউজিয়াম রূপে ব্যবহৃত। কিন্তু তলস্তোই-এর কর্মজীবনকে ভাবাই যায় না ইয়াস্নায়া পলিয়ানাকে বাদ দিয়া। তাঁহার ডায়ারীতে তলস্তোই লিখিয়া গিয়াছেন—রাশিয়া ও তাহার প্রতি আমার মনোভাব আমার পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন আমার ইয়াস্নায়া পলিয়ানাকে বাদ দিয়া। ইয়াস্নায়া পলিয়ানাকে বাদ দিয়া হয়তো আমি আরো স্পষ্ট দেখতে পারি আমার জন্মভূমির পক্ষে প্রয়োজন সাধারণ কর্মবিধি। কিন্তু তাকে এমন আবেগ দিয়া ভালোবাসতে পারি না। তাই বিশ্বের সমগ্র সাহিত্যসেবীর দৃষ্টিতে ইয়াস্নায়া পলিয়ানাই তলস্তোই-তীর্থ।

পিটার্সবুর্গ হইতে ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় ফিরিয়া আসিয়া তলস্তোই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কর্মোদ্যোগে আপন জীবনদর্শনকে বাস্তবে রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেইকালের জার-শাসিত রাশিয়ায় দেশব্যাপী দুর্গতির পরিমাপ সম্বন্ধে বিপ্লবী গণবাদীদের সহিত তাঁহার কোনরূপ মতভেদ ছিল না। দেশের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল চাষীকুলের ; স্বয়ং জার ও তাঁর অমাত্যবর্গ, এবং অন্যান্য জমিদারগণের অত্যাচারে তাহারা উনিশ শতকের মধ্যভাগেও ছিল এমন প্রপীড়িত ও লুণ্ঠিত যে তাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর। ল্যেফ তলস্তোই নিজেই একজন অভিজাত ভূস্বামীর সন্তান। বাল্যকাল হইতে নিজ পারিবারিক পরিবেশের অভিজ্ঞতায় তিনি জানিতেন এই অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রার হৃদয়হীন আড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতা। ভূমিদাসদের দারিদ্র্যে

ও শিক্ষাভাবে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইত। নিজে জমিদার হইয়া বলিয়া তাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য তিনি ইহাই ঠিক করিলেন যে অন্ততঃ তাঁহার নিজের এলাকার চাষীগণকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতে হইবে। চাই তাহাদের ভিতর শিক্ষাবিস্তার। নিজের ভবনেই স্থাপনা করিলেন বিদ্যালয়, নিজেই গ্রহণ করিলেন শিক্ষণের দায়িত্ব। তাঁহার সংকল্প, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ মানবীয় আদর্শের অনুকূল, তাহাই বিতরণ করিতে হইবে তাঁহার শিক্ষার্থীদের হিতার্থে। ছাত্র বয়সে ল্যেফ তলস্তোই যত না বিদ্যার্চনা করিয়াছিলেন, শিক্ষক হইয়া তাহার পরিমাণ বহু গুণ বাড়াইয়া দিলেন, আত্মোৎকর্ষ ছাড়া শিক্ষকবৃত্তি যে নিরর্থক। নানা শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রীকের মতো কঠিন ভাষাও তিনি তিনমাসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইউরোপের নানা প্রগতিশীল দেশ ঘুরিয়া শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনেও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। অর্জিত জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাহির করিলেন শিক্ষাবিষয়ক সাময়িক পত্র—"ইয়াস্নায়া পলিয়ানা।" এমন প্রবল আবেগে তলস্তোই এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করিলেন যে সাহিত্য-রচনার ধারা প্রায় শুকাইয়া আসিল। তাঁহার মতো প্রতিভাশালী লেখকের এই বিপথগামিতায় তুর্গেনিয়েফ পর্যন্ত আশঙ্কা ও দুঃখপ্রকাশ না করিয়া পারিলেন না।

কিন্তু তুর্গেনিয়েফ তলস্তোই-এর এই নূতন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারেন নাই। জমিদার তলস্তোই-এর এই প্রচেষ্টাকে চিরদিন-প্রবঞ্চিত কৃষকেরা প্রথম হইতেই দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে, এইরূপ কল্পনা করা মূঢ়তা। এই নিষ্ঠুর সত্যকে আত্মস্থ করিতে তলস্তোইকে অন্তর্বেদনার জ্বালা সহিতে হইয়াছে বহুদিন। শেষ পর্যন্ত আসিলে তাঁহার সাফল্য। শ্রেণীগত আত্মাভিমানের ভার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পারিয়াছিলেন হইয়া উঠিতে চাষীগণের আপনজন। বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দে যখন ঘোষিত হইল ভূমিদাসত্বের অবলোপ, তাহা তলস্তোই-এর সত্য দৃষ্টিকে ঠকাইতে পারিল না। তিনিও ঘোষণা করিলেন, আইনসত্ত্বেও রহিয়া গেল "সেই দারিদ্র্য, সেই অন্ধকার, সেই ক্ষুধা।" হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগস্থাপন করিতে পারায় তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল কেবল কৃষকের কুটিরদ্বার নয়, তাহাদের অন্তরদ্বারও। তাহাদের সবরকমের দুঃখ-সুখ ও কামনা-বাসনা, তাহাদের মানসলোকের দুর্লক্ষ্য দ্বান্দ্বিক গতির সব জটিলতা

তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল মানচিত্রের মতো সুস্পষ্ট। যে অভিজাত 'কাউন্ট' অদূর ভবিষ্যতে রুশ সাহিত্যে 'মুঝিক'-এর মুখে ভাষা দিয়া তাহাকে অমর করিয়া তুলিবেন তাহারই উপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল এই কৃষক-শিক্ষার কর্মকাণ্ডে। ভবিষ্যৎ সাহিত্য-গুরুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল এই কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত। তলস্তোই-এর গদ্যরচনা রুশ-সাহিত্যের অন্যতম বিস্ময়। এ বিষয়ে তাঁহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন কেবল পুশকিন ও তুর্গেনিয়েফ। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিলে, বিশালতায় ও বৈচিত্র্যে তলস্তোই-এর গদ্য যে তুলনাতীত গোর্কী ও শোলহফ-ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই অপরূপ গদ্য-রচনার গোপন রহস্য তলস্তোই-এর দৃষ্টিগোচর হয় তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক ও ছোটগল্প প্রণয়নের প্রয়াসে। আদর্শ গদ্যরচনা কিরূপ হওয়া চাই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তিনি: তাহা হওয়া চাই—সুগঠিত, সংক্ষিপ্ত, সরল ও সর্বোপরি স্বচ্ছ। মনে হয়, ফ্লবেয়ার-এর মতো উন্নাসিক স্টাইল-বাদীও এই সংজ্ঞায় খুঁত ধরিতে পারেন না।

তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে ইয়াস্নায়া পলিয়ানার কৃষককুলের পিতৃস্বরূপ হইয়া রাশিয়ার বিশাল কৃষকসমাজের সহিত একাত্ম হইবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তলস্তোই-এর জীবনদর্শন খণ্ডিত হইয়া গেল। তিনি বিজ্ঞান-বিমুখ হইয়া পড়িলেন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রভাবে নানাবিধ যন্ত্রের প্রয়োগে পশ্চিম ইউরোপে শ্রমশিল্পের প্রবর্তন হয়, ধনতন্ত্র আবির্ভূত হয়। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে কৃষকের সনাতন জীবনযাত্রায় আসে বিপ্লব। রুশদেশে এই সম্ভাবনা তখন স্পষ্ট হইতেছিল, তাহাতে তলস্তোই হইলেন ত্রস্ত। তিনি কৃষককুলের মুক্তি চান জারতন্ত্রের নিষ্পেষণ হইতে। কিন্তু কৃষককুলের গ্রামীন সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া যায়, কৃষকে ও জমিদারে মানবিক সম্পর্ক লোপ পাইয়া স্থাপিত হয় কেবল টাকাকড়ির লেন-দেন, ইহা তাঁহার অ-কাম্য। কৃষকসমাজের স্থায়ী মঙ্গল, যাহা তাঁহার ঈপ্সিত, তাহা যে যন্ত্রের প্রবর্তন, শ্রমশিল্পের প্রসার ও গণবাদের অভিজ্ঞতার পথ দিয়া সমাজবাদের অভিমুখে অগ্রসর না হইলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—এই বৈজ্ঞানিক সত্য তিনি কিছুতেই দেখিতে পাইলেন না। কৃষকের দুঃখে তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁহার সত্যনিষ্ঠাকে রাহুগ্রস্ত করিয়া দিল। তাঁহার জীবনদর্শনে এই স্ববিরোধ তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত পীড়া দিয়াছে। দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার হইতে মুক্তির

সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইলেন না বিজ্ঞান-সম্মত বিপ্লবের পথে, তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া পরিচালিত হইল অজানা রহস্যবাদের পথে, অজ্ঞেয় নিয়তিবাদের পথে। তাঁহার রচিত লোকশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষামূলক গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি সুবৃহৎ উপন্যাসগুলি পর্যন্ত এই অসম্পূর্ণতার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

ল্যেফ তলস্তোই-এর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমক্ষমতা ছিল অপরিমীম। শিক্ষাব্রত, অশ্বারোহন, সঙ্গীতচর্চা, জমিদারি পরিচালনা, নব পরিণীতা ভার্যার সহিত মিলিয়া ঘর গড়িয়া তোলা—কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তি আসিত না। ইহার মধ্যেও চলিতেছিল সাহিত্যরচনা। কিন্তু সেইসব খণ্ডরচনায় এই বিধি-নির্দিষ্ট বিরাট স্রষ্টা তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। অন্তরে অন্তরে তিনি খুঁজিতেছিলেন এমন কোন বিষয়বস্তু যাহার উদার আকাশে তাঁহার শিল্পপ্রতিভা ঈগল পাখির মতোই পাখা মেলিয়া উড়িতে পারিবে, পৃথিবীর তুচ্ছতম দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি না হারাইয়া। যে বৎসরে তাঁহার বিবাহ, সেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল বরদিনো-র যুদ্ধের পঞ্চাশতম স্মৃতিবার্ষিকী। পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও তলস্তোই ভুলিতে পারেন নাই ক্রাইমিয়ার সংগ্রামে রাশিয়ার জাতীয় অপমান। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের স্মৃতিতে তাই তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। রাশিয়ার জাতীয় ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিন আর আছে কি? বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজিত অবস্থায় মস্কো হইতে পলায়ন ইউরোপীয় ইতিহাসের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল। একটি বিরাট বিষয় অবলম্বনে যে বৃহৎ উপন্যাস রচনার আকুতি তলস্তোই অনুভব করিতেছিলেন নিজের অন্তরে, তাহা এখন ধরা দিল তাঁহার কল্পনার নেত্রে। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে বর্তমান যুগেও হোমেরীয় ধরনে এপিক রচনা করা অসম্ভব নয়। আরম্ভ হইল প্রস্তুতি, একদিকে অধ্যয়ন, অন্যদিকে তথ্যসংগ্রহ। চলিলেন ম্যাপ-হস্তে বরদিনোর যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে, তখনো-জীবিত যোদ্ধাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে। ১৮৬৩-১৮৬৮, এই পাঁচ বছর ধরিয়া চলিল নিরবচ্ছিন্ন লেখনী-চালনা। নিজের রচনার প্রতি তলস্তোই-এর ছিল নির্মম সমালোচকের দৃষ্টি। কাটিয়া-কুটিয়া নূতন করিয়া তুলিতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা ছিল না। তলস্তোই-এর দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ, অথচ চশমা তিনি ব্যবহার করিতেন না। মাকড়সার জালের মতো জড়ানো গুঁড়ি গুঁড়ি লেখাকে উদ্ধার করিয়া বারবার কপি করার

প্রিয় দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করিলেন শিক্ষিতা বিদুষী ভার্যা। ক্রমে রচনা প্রকাশযোগ্য হইয়া উঠিল, প্রকাশিত হইতে লাগিল খণ্ডে খণ্ডে। "সংগ্রাম ও শান্তি" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপময় সাড়া পড়িয়া গেল। আর তুর্গেনিয়েফ দিলেন দৃপ্ত অভিমত, 'এই উপন্যাসে আছে এমন অনেক দৃশ্য যাহা সমগ্র ইউরোপে এক তলস্তোই ছাড়া আর কাহারো পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না।'

'সংগ্রাম ও শান্তি' হোমেরীয় ধরনের রচনা, সন্দেহ নাই। হোমেরীয় যুদ্ধকাহিনী ইলিয়াদ-এর একটি বিশেষত্ব, অনেক ইউরোপীয় বিজ্ঞ আলোচকের মতে, এই যে তাহাতে ঘটনাবলীর ও চরিত্রাবলীর বিস্ময়কর প্রাচুর্য সত্ত্বেও কাহিনী কেন্দ্রচ্যুত হয় না, সমগ্রের সহিত বিশেষের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় না। কাহিনীকার হিসাবে তলস্তোই-ও যে এই দাবি করিতে পারেন তাহা এখন সুবিদিত। কিন্তু হোমরের অনুগামী হইয়াও তলস্তোই জানিতেন যে তিনি আধুনিক কালের লেখক, যে কালে হোমেরীয় জগতের পুনর্নির্মাণ সম্ভব নয়। 'সংগ্রাম ও শান্তি'-কে তাই তিনি বলিয়াছিলেন—ফিলসফিক্যাল এপিক। হোমেরীয় ইলিয়াদে ঝোঁক বেশী বহিরঙ্গ কর্মকাণ্ডের দিকে। তলস্তোই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছেন প্রতিটি সৃষ্ট চরিত্রের ভাবলোকের দিকে। কোনরূপ জীবনদর্শন লইয়া হোমর মাথা ঘামান নাই। পার্থিব জীবনের ছোট বড় সব রকমের দুঃখ-সুখকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করিতে পারার শক্তিতে তাঁহার জীবনদর্শন প্রতিফলিত। কিন্তু তলস্তোই-এর 'সংগ্রাম ও শান্তি'র বিশাল চিত্রপটে অসংখ্য নরনারীর তরঙ্গোপম সঙ্গমের ও প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যকে সমুদ্রসম ঐক্যতানে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে এক বিশ্বপ্রেমিক মানবাত্মার বিশিষ্ট জীবনদর্শন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'সংগ্রাম ও শান্তি'-র উপজীব্য বিষয়বস্তু হইতেছে আউস্তেরলিৎস্-এর যুদ্ধ হইত (১৮০৫) বরদিনো-র যুদ্ধে নেপোলিয়নের সামরিক বিজয় (১৮১২) ও তৎপরে মস্কোর অগ্নিকাণ্ড এবং জনযুদ্ধে নেপোলিয়নের অভাবিত পরাভব ও চমকপ্রদ পলায়ন। অন্যূন ছয়শত নরনারীর চরিত্র এই উপন্যাসে সন্নিবেশিত। পড়িতে পড়িতে বিস্মিত পুলকে লক্ষ্য করিতে হয় যে ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান চরিত্রের কর্মের ও ভাগ্যের সহিত কল্পিত চরিত্রগুলির কর্ম ও ভাগ্য কী নিগূঢ়সূত্রে গ্রথিত। একটি সুগভীর নীতিবোধ বহুভঙ্গিম ধারায় সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ন্যায় তাহাই যাহা সমগ্র মানবসমাজের সংযোগ ও সংহতির সহায়ক, অন্য তাহাই যাহা ইহার পরিপন্থী। তলস্তোই-এর বিচারে তাই পশ্চাৎ রুশ জনগণের বীরত্বে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজয় সামরিক ঘটনা না নৈতিক বিচার-দণ্ড। তিনি লিখিয়াছিলেন, "মানবসমাজকে বিভক্ত করা পাপ।" হয়তো, তাঁহার উপন্যাসের নামকরণেও, ভাইনা ঈ মির,—তিনি দি গিয়াছেন এই ইঙ্গিত। পৃথিবীতে এমন আর কি আছে যাহা 'ভাইনা' অর্থাৎ—সংগ্রামের চেয়ে মানবসমাজকে বিভক্ত করে? আর রুশভাষার প্রথম শিক্ষার্থীকেও জানিতে হয় 'মির' শব্দের দুটি অর্থই—বিশ্ব ও শান্তি—সমান প্রচলিত, যদিও তাহার তৃতীয় অর্থটি—গ্রামগোষ্ঠী—এখন আর তেমন প্রচলিত নয়। রুশীয়েরা অসংকোচ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করেন যে বিশ্ব শান্তি সংসদের প্রধান আবেদন—বিশ্বময় শান্তি হোক—রুশভাষায় প্রকাশ করা যায়—একটি শব্দেরই বিভিন্ন প্রয়োগে—মির মিরু। মনে পড়ে, এক উজ্জ্বল প্রভাতে রুশ-সেনাপতি নিকলাই রস্তফ্-এর সহিত এক অষ্টা সৈনিকের সাক্ষাৎ ও জার্মানভাষায় এই বলিয়া পরস্পরকে অভিবাদন—জয় হোক সমগ্র বিশ্বের। এই অভিবাদনে তলস্তোই-এর জীবনদর্শনের যে আশাবাদ স্পন্দিত, তাহা জীবনের নারকীয় নিষ্ঠুরতাকে, রুদ্রের বাম বাহুকে পাশ কাটাইয়া নয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া রুদ্রের দক্ষিণ বাহুর শক্তিমত্তায় অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া। মনে পড়ে আর একটি দৃশ্যের কথা। মহৎপ্রাণ আন্দ্রেই বল্‌কনস্কি মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশার ও দুশ্চিন্তার ভারে মুহ্যমান, তখন তাঁহার বন্ধু দার্শনিক পিয়ের বেজুকফ তাঁহাকে বুঝাইতেছে যে মানুষ সংসারে নয় নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক, শান্তি ও সত্য কেবল কথার কথা নয়, আছে তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সমর্থন করে মানব-সমাজের সুবৃহৎ ঐক্যের বিজয়ে আমাদের বিশ্বাসকে। "তখন ছিল চারিদিকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি, কেবল তটিনীর ছোট ছোট ঢেউগুলি ক্ষীণ বলে আঘাত করিতেছিল নৌকার তলদেশে। প্রিন্স আন্দ্রেই-এর মনে হইল ঢেউয়ের কলধ্বনি যেন পিয়ের-এর কথাই বলিয়া চলিয়াছে—'বিশ্বাস করো, ইহাই সত্য'।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-রুশ সংঘর্ষে সংগ্রামের নায়ক কে ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে তলস্তোই-এর যে সিদ্ধান্ত তাঁহার উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেখা যায় তাঁহার মহৎ ও বিরাট জীবনদর্শনে বিজ্ঞানবিমুখতা কিভাবে সক্রিয়

ছিল। তাঁহার ধারণায় সংগ্রামের প্রকৃত নায়ক না নেপোলিয়ন না কুতুজফ্, নায়ক হইতেছে সাধারণ সৈনিকশ্রেণী, যাহাদের অগণিত ব্যক্তিগত আত্মিক শক্তি সম্মিলিত হইয়া নির্দিষ্ট করে জয় বা পরাজয়। নেপোলিয়ন ছিলেন অহংসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক শক্তিমত্ততার প্রবলতম প্রতিভূ, সাধারণ সৈনিকের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না বা রাখার প্রয়োজন মনে করিতেন না, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেন কেবল সামরিক সংঘবদ্ধতার প্রতাপে, হুকুমের লগুড়াঘাতে। তলস্তোই-এর বিচারে, তাই তাঁহার পরাজয় ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে, রুশ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কুতুজফ্ কখনও কোনো সামরিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না স্বীয় বিচার-বুদ্ধির প্রাথর্যে। তিনি আগে হইতেই কিছু ভাবিয়া রাখিতেন না, কিছু স্থির করিতেন না। তিনি শুনিতেন সকলের কথা, বুঝিতেন সকলকে। তিনি জানিতেন যে তাঁহার একক বিচারের চেয়ে আছে বিরাটতর, তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিশালী শক্তি—তাহা হইতেছে ঘটনার অনিবার্য প্রবাহ। ইহাকে তিনি লক্ষ্য করিতে জানিতেন, তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে জানিতেন, তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ইহার বিরোধী হইলে জানিতেন নিজেকে সংযত করিতে, থামিয়া থাকিতে। স্বয়ং গ্রন্থকার কুতুজফ্-এর নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—"বহুবৎসরের সামরিক অভিজ্ঞতায় তিনি জানিতেন ও পরিণত বুদ্ধি দিয়া বুঝিতেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে মরণপণ করিয়া লড়িতেছে সেখানে নেতৃত্ব করা যে কোন একক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জানিতেন সংগ্রামের ফলাফল নির্দিষ্ট হয় উচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নয়, যুধ্যমান বাহিনীর ভৌগোলিক পরিবেশে নয়, অস্ত্রশস্ত্রের ও সৈন্যসংখ্যার পরিমাণে নয়; নির্দিষ্ট হয় সেই সূক্ষ্ম, দুর্লক্ষ্য শক্তি দিয়া যাহাকে বলা হয় যোদ্ধার আত্মিক শক্তি। এই শক্তিকেই তিনি অনুসরণ করিতেন, এবং তাঁহার পক্ষে যতটা সম্ভব, ইহার ভিত্তিতে নেতৃত্ব পরিচালনা করিতেন।" স্পষ্ট দেখা যায়, তলস্তোই-এর এ অভিমত নেপোলিয়ন বা কুতুজফ্ কাহারো পক্ষে ইতিহাসসম্মত সুবিচার নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক বিজ্ঞানের শিক্ষার বা প্রয়োগের কোন স্থান নাই—এ অভিমত একান্ত অবাস্তব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষার অবহেলা করিয়া সাধারণ সৈনিকের অস্পষ্ট নিরুদিষ্ট সংস্কারজনিত—ইন্‌স্‌টিংক্‌টিভ—প্রজ্ঞার উপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা স্থাপনেই আছে তলস্তোই-এর এই দার্শনিক বিভ্রান্তির দুর্বলতা। বিপ্লবী

গণবাদের সহিত মতানৈক্যের ফল এইভাবে তাঁহার জীবনদর্শনে ও কারুস্ফুতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

এই পশ্চাৎগামিতার অন্য একটি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় 'নাতাশা' চরিত্রের পরিণতিতে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে সমগ্র উপন্যাসে যত চরিত্র তলস্তোই অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তিতে নাতাশাই সর্বাগ্রগণ্য। তাহার জীবন সহজ-সরল নহে, অনেক জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তবু নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অন্তরের সহজাত আনন্দ, অকপট অনুভূতি, সংবেদনার সুকুমারত্ব। অন্যের অন্তর্বেদনায় অনুকম্পনশীলতা তাহার চিত্তলোকের ঐশ্বর্য। উপন্যাসের অন্য যে কোন চরিত্রের চেয়ে সে আচরণে ও অনুভূতিতে সাধারণ মানুষের সন্নিকটবর্তী, জীবনের মাধুর্য তাহার মধ্যে মূর্ত। কিন্তু এই মাধুর্যের জ্যোতির্মণ্ডল তাহার চরিত্র হইতে খসিয়া পড়ে, উপন্যাসের পরিশিষ্টে নাতাশা তখন তাহার বৃহত্তর জীবন হইতে বহুদূরে, অন্তরলোকের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে উদাসীন। পিয়ের-এর প্রেমময়ী স্ত্রী হিসাবে সে সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন গণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন, পারিবারিক কর্তব্যশীলতায় একাগ্রচিত্তে ব্যাপৃত। স্বামীসেবাতেই তাহার অনন্যসাধারণ নারীজীবনের একান্ত পরিসমাপ্তি। অনেকের মতে, নাতাশা-র এই পরিণতিতে আছে তলস্তোই-পত্নীর অনুপ্রাণনা। তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের তখনকার কালের ইতিহাস স্মরণে রাখিলে ইহা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারা যায়। সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হয় যে তলস্তোই তখনও ভুলিতে পারেন নাই, নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়া পিটার্সবুর্গের বিপ্লবী গণবাদীদের সহিত তাঁহার মতবিরোধ, যাঁহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন ও সরবে প্রচার করিতেন সামাজিক ক্ষেত্রে নরনারীর সমানাধিকার।

পিয়ের ও নাতাশা-র জীবনের এই গার্হস্থ্য পরিসমাপ্তি যে স্বয়ং গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় নাই, এরূপ ভাবিবার সঙ্গত কারণ আছে। 'সংগ্রাম ও শান্তি' শেষ করার পর তিনি আর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহার বিষয়বস্তু হইবে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে পিটার্সবুর্গের সেনেট স্কোয়ারে জারতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনকল্পে রুশ অভিজাত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত এক অংশের বিপ্লবী অভ্যুত্থান। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন

কেমন করিয়া এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া যায় রুশ জনগণের সহযোগিতার অভাবে। প্রথম আলেক্‌জান্দরের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর প্রথম নিকলাই নূতন সম্রাট হইয়া এই 'দেকাব্রিস্ট অভ্যুত্থানের' নেতৃবর্গকে কিরূপ কঠিন হস্তে শাসন করেন তাহাও ইতিহাসবিখ্যাত। স্বয়ং পুশকিন এই আন্দোলনের সহিত গোপন সংযুক্ত ছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, পিটার্সবুর্গ হইতে নির্বাসিত থাকায়। পরে জার নিকলাই তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করেন—সেদিন পিটার্সবুর্গে উপস্থিত থাকিলে তুমি কি করিতে?—তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন উত্তর আসিয়াছিল—সেনেট স্কোয়ারে যোগ দিতাম। অভিজাতশ্রেণীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াও প্রায় শতবর্ষ পরবর্তী সফল অভ্যুত্থানকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে লেনিনের প্রশস্তি স্মরণীয়। দুঃখের বিষয় তলস্তোই এই উপন্যাস লিখিয়া যান নাই। ইহার আংশিক অস্তিত্বের কথাও আমার জানা ছিল না। কিন্তু ১৯৬০ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক ইয়েমিলফ লিখিত প্রবন্ধে সন্ধান পাওয়া গেল যে তলস্তোই ইহার কয়েক পরিচ্ছেদ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় পিয়ের ও নাতাশা-র ব্যক্তিত্ব ও প্রেম সাংসারিক সুখদুঃখের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই, বৃহত্তর জীবনের পরিধিতে বিস্তৃত হইয়া যায়। পিয়ের ও নাতাশা যোগ দেন দেকাব্রিস্ট আন্দোলনে, দুজনেই নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায় ও তথাকার বন্দীজীবনের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা সমানভাবে বহন করেন। ইহার অধিক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহাতেই বোঝা যায় তলস্তোই-এর মন ও মতামত স্থবির ছিল না, ছিল চলিষ্ণু।

এই চলিষ্ণুতার উজ্জ্বলতর প্রমাণ তলস্তোই-এর দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস—আনা কারেনিনা। ইহার রচনারম্ভ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস—অর্থাৎ 'সংগ্রাম ও শান্তি' রচনারম্ভের প্রায় দশ বৎসর পরে। এই দশ বৎসরে রুশদেশে ধনতন্ত্রের দ্রুতগতি প্রসার হইতেছিল যাহা তলস্তোই-এর স্বপ্নময় আশাবাদের জগতে আনিয়া দেয় ভূকম্পন। 'আনা কারেনিনা' এই ভূকম্পনের সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি। উনিশ শতকের সপ্তম দশকে যে ঝড় রুশদেশের সামাজিক জীবনকে তছনছ করিয়া দিতেছিল তাহারই পরিমাপ করিয়াছেন তলস্তোই অকুতোভয়ে; অকুতোভয়ে কিন্তু সুগভীর বেদনায়। নির্ভীকতা ও বেদনার এই দ্বান্দ্বিক অনুস্যূতি-ই ট্রাজিক অনুভূতির গভীরতম উৎস।

'আনা কারেনিনা' বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি। অধ্যাপক ইয়েমিলভ ইহাকে সঙ্গতভাবেই তুলিত করিয়াছেন হ্যামলেটের সহিত। আপাতদৃষ্টিতে 'আনা কারেনিনা' অভিজাতশ্রেণীর স্বামীত্যাগিনী ভ্রষ্টা নারীর ভাগ্যের ইতিবৃত্ত। কিন্তু তাহার অন্তিম অপঘাতে সমগ্র বিশ্বের পাঠকবর্গের অন্তর মথিত ও নয়ন অশ্রুসজল। তবে কি গ্রন্থকার তাহার অপরাধকে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছিলেন? তলস্তোই-এর চিন্তাজগতে এ প্রশ্নের আবির্ভাবও অকল্পনীয়; পারিবারিক পবিত্রতা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যে আদর্শে, তাঁহার মতে, বিশাল মানব-সমাজেরই গড়িয়া ওঠা উচিত। এ পাপকে ক্ষমা করা তো ন্যায়বোধের মূলোৎপাটন। অথচ কি অন্যায় করিয়াছিল তলস্তোই-এর এই মানস-দুহিতা? সে চাহিয়াছিল তাহার জীবনে তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া ভালোবাসার সার্থকতা। নারীর এই প্রেমাবেগের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া তলস্তোই বুঝিতেন বিশ্বসাহিত্যে তাহার তুলনা অতি বিরল। ইহাকেও তলস্তোই সরাসরি অভিযুক্ত করিতে পারেন না অন্যায় বলিয়া, পাপ বলিয়া। অভিজাত সমাজে ব্যাভিচারের প্রচলন তলস্তোই-এর অজ্ঞাত ছিল না। 'আনা কারেনিনা'-র অনেক পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ আছে। তবে কেন একমাত্র আনা-র নিয়তি হইল আত্মহত্যা? কারণ, সে প্রেমকে ব্যভিচারে পরিণত করিতে চাহে নাই, সমাজের লোকাচারের সহিত রফা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহে নাই। তাহার প্রেমের দাবি ছিল অকুণ্ঠ, সেই দাবির সত্যতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সে একাকিনী, সমাজের নিপীড়নী শক্তির সম্মুখীন হইতে সাহস পাইয়াছিল। তাহার নিয়তির ক্রূর পরিহাস এই যে তাহার প্রেমের সাফল্যের সমাধান তাহার পরিবেশের মধ্যেই উপস্থিত ছিল। ল্যেভিন-এর সহিত তাহার মিলন হইলে দুজনের জীবনই হইতে পারিত সার্থক। ল্যেভিন-চরিত্র যে গ্রন্থকারেরই "অপর আত্মা" ইহার ইঙ্গিত ল্যেফ তলস্তোই তাহার নামকরণের ভিতরে রাখিয়া গিয়াছেন। 'আনা কারেনিনা'-র তথা-কথিত "দুই গল্পের" ইহাই হইল গোপন যোগসূত্র, এবং ইহাকে গোপন রাখাই ছিল ওস্তাদ-শিল্পী তলস্তোই-এর মনোগত অভিপ্রায়। এই সম্ভাব্য মিলনের পথে দুস্তর বাধা সামাজিক বাধানিষেধ। মার্কস বলিয়া গিয়াছেন, নারীর সামাজিক সম্মানের ও অধিকারের মাত্রা দিয়া যে কোন সমাজের প্রগতির পরিমাপ করা সম্ভব। আনা তাহার আত্মহত্যা দিয়া প্রমাণিত করিল তখনকার রুশ-সমাজের আমূল পরিবর্তনের আবশ্যকতা, যেমন হ্যামলেটের গোপন হত্যা

সূচিত করে বুর্জোয়া সমাজের অক্ষমতা পরিপূর্ণ মানবিক আদর্শকে জীবিত রাখায়। লোহার পথে লোহার রথের চাপে আনা-র নারীদেহের চরম বিলুপ্তি—ইহার দায়িত্ব, তলস্তোই-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের আচরণে নহে, রুশদেশে সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিষ্করুণ অগ্রগতিতে।

ব্যক্তিগত জীবনেও তলস্তোই এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলেন না। 'আনা কারেনিনা' রচনা-সমাপ্তি ও তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি প্রায় সমসাময়িক—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। স্বশ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইবার সংকল্প এই সময় হইতে ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়। স্বগৃহে স্ত্রী, পুত্রকন্যা, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদির দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও তিনি ক্রমশঃ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে, চিন্তায় কর্মে তিনি হইয়া ওঠেন কৃষকশ্রেণীর আত্মীয়। পারিবারিক মায়ামমতা তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেও তাঁহাকে অশান্ত করিয়া তুলিত তাঁহার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ—অভিজাত জীবনযাত্রার সহিত সংঘর্ষ কৃষকী মতবাদের। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে এই মতবাদের রং ক্রমশ গাঢ়তর হয়। শিল্পের মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্যকে আরো প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে তিনি হাত দেন নাটক লেখায়। কিন্তু জনপ্রিয়তার আকর্ষণে তলস্তোই কখনও তাঁহার শিল্প-বিবেককে খণ্ডিত করেন নাই। তিনি মাত্র পাঁচখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখিয়াছিলেন ও আর একখানি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। অনেকগুলি প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পরে। সবগুলিই মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র এখনও মঞ্চস্থ হয়। তাহাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিস্তারও কম উল্লেখযোগ্য নয়। দুটি নাটককে গ্রন্থকার নিজে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন; একখানি ট্র্যাজিডি, "অন্ধকারের আধিপত্য", অপরটি ট্র্যাজি-কমেডি—"আলোক-প্রাপ্তির ফলাফল।" নাটকের উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না, যথোপযুক্তভাবে রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয় না দেখিলে। এই উপভোগের সুযোগ রুশদেশের তলস্তোই-ভক্তরা এখনও প্রায়ই পান। "অন্ধকারের আধিপত্য" অভিনীত হয় মালি থিয়েটারে, ও "শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলাফল"—আর্ট থিয়েটারে। মালি থিয়েটারে "অন্ধকারের আধিপত্যে"-র অভিনয় দেখিতে পাওয়া নাট্যামোদীর পক্ষে এক চরম অভিজ্ঞতার সমতুল্য। তখন বুঝিতে পারা যায় কেন বার্নার্ড শ ও এমিল জোলা এ নাটকটির গুণগানে প্রায় উন্মত্তের ন্যায় উচ্ছ্বসিত, কেন

রুশদেশের নাট্য-সমালোচনায় ইহাকে "রাজা লীয়র"-এর সমপর্যায়ভুক্ত ভাবিবার সাহস করা হয়। আর্ট থিয়েটারে অভিনীত "শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলাফলে"-সানন্দে উপভোগ করা যায় নাট্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা। "অন্ধকারের আধিপত্য" প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, "শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলাফল" ১৮৮৯-তে। প্রকার বিভিন্ন হইলেও উভয়ের একই উদ্দেশ্য—কৃষকসমাজের জীবনচিত্রে ধনতান্ত্রিক "সভ্যতা"-র বৈনাশিক প্রভাব। 'আনা কারেনিনা' রচনার পরের দশ বছরে সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তলস্তোই-এর মতামত কত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল তাঁহার এই দুটি নাটক তাহার সাক্ষ্য চিরকাল বহিয়া থাকিবে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনারম্ভ হয় তাঁহার তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাসের—'পুনরুজ্জীবন'। কিন্তু শেষ করিতে লাগিল প্রায় দশ বৎসর। ইহার নায়িকা কাতুশা মাসলোভা পাপীয়সী নারী। আনা-র মতো সে পতিপরিত্যাগিনী ভ্রষ্টা পত্নী নহে, সমাজপরিত্যক্তা গণিকা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে উপন্যাস রচিত হইল—তাহাতে তলস্তোই লিপিবদ্ধ করিলেন উনিশ শতকের শেষ পর্বের রুশীয় সমাজের তীব্র সমালোচনা। সামাজিক অধঃপতনের সহিত তাল রাখিয়া সমালোচনার ব্যাপকতা ও তীক্ষ্ণতাও উচ্চ নিখাদে চড়িতে লাগিল। কোন স্তরই বাদ গেল না। অভিজাত জমিদারবর্গ, শ্রমশিল্পের মালিকশ্রেণী, ও বিশেষ করিয়া জারতন্ত্রের ও ধর্মযাজনার ভণ্ডামী তাঁহার লেখনীর কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া উঠিল। ১৮৯১—৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, তলস্তোই সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া তখন আর্তত্রাণে লাগিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে জারের উক্তি যে রাশিয়াতে দুর্ভিক্ষ নাই, আছে কেবল স্থানীয় খাদ্যাভাব, তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। এই সময়ে দেশব্যাপী যে লোক-গণনা হয় তাহাতেও তলস্তোইঅংশ গ্রহণ করিয়া মস্কো শহরের দরিদ্রশ্রেণীর বাস্তব অবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয় পান। তিনি লিখিয়াছিলেন—"যদি মস্কো শহরে লোকেরা দশে দশে, শতে শতে, হাজারে হাজারে, অযুতে অযুতে, শীতে ও ক্ষুধায় কষ্ট পায় ও প্রাণ দেয়, তাহার জন্য দায়ী তাহারা নহে; দায়ী তাহারাই যাহারা প্রাসাদে বাস করে ও গাড়ি হাঁকাইয়া বেড়ায়।" আর খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতা হইয়াও তলস্তোই যে নির্দয়ভাবে ধর্মযাজকদের চার্চ পরিচালনার গলদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছিলেন তাহাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের যুগপৎ ত্রাসের ও ক্রোধের অবধি রহিল না। তাহারা সাময়িকপত্রে

প্রকাশ্যভাবে প্রশ্ন তুলিল—"আমাদের দেশে আমরা দেখিতেছি দুজন জারের রাজত্ব—দ্বিতীয় নিকলাই ও ল্যেফ তলস্তোই; কার শক্তি বেশী?" শক্তি-পরীক্ষায় বিলম্ব হইল না। "পুনরুজ্জীবন" প্রকাশের কিছুকাল পরেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তলস্তোই রুশ-চার্চ হইতে বিতাড়িত হইলেন, ধার্মিক শ্রেণীর তালিকা হইতে তাঁহার নাম দূরীভূত হইল। তাঁহার উপর বর্ষিত হইল চার্চের অভিশাপ। এই সংবাদ প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষিত হইতে লাগিল রুশদেশের সর্বপ্রান্ত হইতে সমর্থনসূচক তারবার্তা, পত্র ও অভিনন্দন তলস্তোই-এর ঠিকানায়। তাহাদের মধ্যে ছিল নবজাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। এক কাচের কারখানার কর্মীরা তাঁহাকে পাঠান একতাল সবুজ কাচ। তাহাতে সোনার অক্ষরে মুদ্রিত ছিল—"গভীর সম্মানাস্পদ লোফ নিকলায়েভিচ! আপনি সেই সব মহাপুরুষদের একজন যাঁহারা আপন যুগের অগ্রবর্তী হইয়া চলেন। অতীতে তাঁহাদিগকে অগ্নিতে দাহ করা হইত, কারাগারে বা নির্বাসনে নিষ্পেষণ করা হইত। ফারিসি ধর্মধ্বজীরা আপনাকে তাহাদের যেমন খুশি ও যাহা হইতে খুশি বহিষ্কার করিয়া দিক। রুশীয় জনগণ চিরদিন গর্ববোধ করিবে যে মহৎ আপনি তাহাদের আপন প্রিয়জন।" এই উপহার তলস্তোই-কে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন যে উপহারে মুদ্রিত বাণী তাঁহার নিকট সবিশেষ আনন্দদায়ক।

ইহার পরে দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। জারতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে প্রথম রুশ-বিপ্লব সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকের অপূর্ব বীরত্ব সত্ত্বেও অবসিত হইল ব্যর্থতায়। ব্যর্থ হইলেও তলস্তোই তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে "১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লব মানবজাতির পক্ষে গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ ও পরিণামে অধিকতর মঙ্গলদায়ক, মহান ফরাসী বিপ্লবের চেয়েও।" অত্যাচার নূতন জীবন পাইয়া উন্মত্ত জিঘাংসায় দেশময় যে বিভীষিকার তাণ্ডব বহাইয়া দিল ইতিহাসে তাহা মন্ত্রী 'স্তোলিপিন-এর কীর্তি' নামে কুখ্যাত। জারের আদেশে বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড নিত্যনিয়মিত ঘটনা হইয়া দাঁড়াইলে তলস্তোই-এর অকুতোভয় সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে নীরব থাকিতে দিল না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল তাঁহার প্রবন্ধ—"চুপ থাকিতে পারি না"। একটি উদ্‌ধৃতি হইতেই ইহার বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা ভাস্বর হইয়া উঠিবে। "এভাবে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

অন্ততপক্ষে আমি এভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, আমি পারি না, আমি থাকিব না। সেইজন্যই আমি লিখিতেছি এই প্রবন্ধ, এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়া আমি ইহাকে প্রচার করিব রাশিয়ায় ও তাহার বাহিরে, যাহাতে দুইয়ের একটি ফল ফলিতে পারে। হয় এই অমানুষিক অত্যাচারের অবসান হইবে; নয়, শ্বেতবস্ত্রে আমার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া টুল হইতে লাথি মারিয়া শূন্যে পাঠানো হইবে যাহাতে আমার ঝুলন্ত ভার আঁটিয়া বসাইবে ফাঁসির তৈলাক্ত রজ্জুকে আমার শুষ্ক-শীর্ণ গলদেশে।" প্রথম রুশ-বিপ্লবের কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক মতামতে গভীর পরিবর্তন দেখা যাইতেছিল। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ও লুণ্ঠন-লীলার তীব্র প্রতিবাদ তিনি জানাইয়াছিলেন তাঁহার "কি করা উচিত?" পুস্তিকায়। তিনি লিখিয়াছিলেন—বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান কর্তারা দাবি করেন যে তাঁহারা সকলেই চাহেন শান্তি, শান্তির জন্য গুরুগম্ভীর আবেদনে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু তাহারই সমকালে বা অব্যবহিত পরেই তাঁহারা তাঁহাদের আইন সভায় প্রস্তাব আনেন অস্ত্রসজ্জার জন্য ব্যয়বৃদ্ধির। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের এইসব আয়োজন কেবল শান্তিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে। প্রথম রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বেই তিনি লিখিয়াছিলেন।—"বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য। বিধ্বস্ত হইবেই এই প্রতিযোগিতার কাঠামো, বদলে আসিবে কমিউনিস্ট সহযোগিতা; বিধ্বস্ত হইবেই এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বদলে আসিবে সমাজবাদ; বিধ্বস্ত হইবেই এই জঙ্গীবাদী ব্যবস্থা, বদলে আসিবে নিরস্ত্রীকরণ ও মোকাবিলা।"

১৯০৮ সালে পূর্ণ হইল তলস্তোই-এর অশীতি বৎসর। পৃথিবীর বহুদেশে প্রতিপালিত হইল তাঁহার জন্মোৎসব। জারের একান্ত প্রচেষ্টা হইল যাহাতে রাশিয়াতে কোনরূপ উৎসব না হয়। কিন্তু ব্যর্থ হইল রাষ্ট্রশক্তির এই ঔদ্ধত্য। রাশি রাশি টেলিগ্রাম, চিঠি, মানপত্র পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় ও মস্কোর আবাস ভবনে। কাতারে কাতারে লোক আসিল ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় কেবল দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে ও নীরবে জানাইয়া যাইতে তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা। পিটার্সবুর্গের একটি কারখানার শ্রমিকেরা তাঁহাকে পাঠাইল অভিনন্দন: "আপনার অপূর্ব-সুন্দর জীবনের অশীতিবর্ষীয় উৎসবের দিনে, যখন আপনার মহান প্রতিভাপূর্ণ প্রতিমূর্তির সম্মুখে গভীর শ্রদ্ধায় অবনত হইতেছে সমগ্র বিশ্ব ও কোটিকণ্ঠে ধ্বনিত

হইতেছে আপনার নাম, তখন কেবল সেই দেশে, আপনার জন্মভূমি হইবার বিরাট গর্ব ঘটিয়াছে যাহার ভাগ্যে, কাহারো অধিকার নাই তাহার কণ্ঠ ধ্বনিত করিতে, আপনাকে অভিনন্দন জানাইতে। তবু অত্যাচারের কৃষ্ণমূর্তি দাসেরা, স্বাধীনতা ও সত্যের হত্যাকারীরা, স্বর্গের ও মর্তের যতরকম শাস্তির ভয় আমাদিগকে দেখাক না কেন, আজিকার দিনে আমরা চাহি না, আমরা পারি না নীরব থাকিতে।"

আশি বছরের অটুট স্বাস্থ্যে এতদিনে ভাঙন ধরিল। তবুও বিরাম নাই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের। আর বিরাম নাই অন্তর্দ্বন্দ্বের, নিজের জীবনযাত্রার সহিত কৃষকের জীবনযাত্রার পার্থক্যে। অবশেষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক রাত্রে ইহা চরমে উঠিল। গভীর নিশীথে শকট চালককে জাগাইয়া ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন চিরকালের মতো ইয়াস্নায়া পলিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া। যাইবার আগে স্ত্রীর জন্য লিখিয়া রাখিয়া গেলেন পত্র:

"আমার প্রস্থানে তুমি কষ্ট পাইবে, তাহাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু বুঝিয়া দেখ ও বিশ্বাস করো যে অন্যরূপ আচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব। গৃহে আমার অবস্থান একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর সবকিছু বাদ দিয়াও যে বিলাসের পরিবেশে আমি বাস করি তাহাতে আমি আর থাকিতে পারি না। আমার বয়সের বৃদ্ধেরা যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে আমি তাহাই করিতেছি: জীবনের শেষদিনগুলি নির্জনতায় ও প্রশান্তিতে কাটাইবার জন্য সাংসারিক জীবনযাত্রা ছাড়িয়া যাইতেছি।

আমার কথা বুঝিয়া দেখিও, ও যদি তুমি জানিতে পারো কোথায় আছি তাহাতেও আমাকে ফিরাইবার চেষ্টায় তথায় আসিয়ো না। তোমার আসাতে তোমার ও আমার দুজনারই অবস্থা মন্দতর হইবে, কিন্তু তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত বদলাইবে না। আটচল্লিশ বছর ধরিয়া আমার সহিত অকপট জীবনযাপনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তোমার প্রতি যাহাকিছু অন্যায় আমি করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি, যেমন আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি যাহাকিছু অন্যায় তুমি আমাকে করিয়াছ।" রাশিয়ার শীতে সেসময়কার দিনের রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে চলিতে চলিতে বিরাশি বছর বৃদ্ধ তলস্তোই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। ছোট রেল-স্টেশন আস্তাপোভোর স্টেশনমাস্টার তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন স্বগৃহে। সেখানেই ২০শে নভেম্বর

তাঁহার শেষনিশ্বাস নির্গত হইল। পরে ইয়াস্নায়া পলিয়ানার পূর্ব নি
স্থানে তাঁহার নির্দেশমতো ধরনে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল।

তলস্তোই-এর ডায়ারিতে লিখিত আছে : "ব্যাপারটা যদিও তুচ্ছ
জানিয়ে যেতে চাই আমার মরনের পরে কি ব্যবস্থা আমার কাম্য।
দেহকে প্রোথিত করার সময় কোনরূপ অনুষ্ঠান আমার অভিপ্রেত
কফিনটি যেন কাঠের হয়, ও যাহার ইচ্ছা সেই যেন ইহাকে বনের
নালার ধারে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শরতের এক অপরাহ্ণে বৃষ্টিধৌত আকাশের অম্লান আ
এই অনাড়ম্বর মহনীয় সমাধির সামনে একাকী দাঁড়াইয়া আমার মন আ
ও দুঃখে আপ্লুত হইয়াছিল। আনন্দ এই জন্য যে আমার মতো বাংলাদে
একজন সাধারণ সাহিত্যসেবীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই পুণ্যতী
বায়ুমণ্ডলকে অন্তরে টানিবার সুযোগ পাওয়া। আর, দুঃখ এইজন্য
তলস্তোই দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, মাত্র সাতবছরের ব্যবধানে,
বিপ্লবের চরম সাফল্য, তাঁহার ঘৃণিত জারতন্ত্রের চরম উচ্ছেদ, তাঁ
প্রাণাধিক প্রিয় কৃষককুলের চরম অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা। বার্নার্ড শ
মতো দীর্ঘায়ু তাঁহার ভাগ্যে থাকিলে নিঃসন্দেহ তিনি পাইতেন লেনি
সশ্রদ্ধ সঙ্গ, যে লেনিন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হই
সার্থক করিয়াছেন তলস্তোই-এর উদার মানবিকতার স্বপ্ন, ও তাঁহার বি
সাহিত্যকৃতির প্রকৃত মূল্য কিভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে তাহার প্র
পথপ্রদর্শক ছিলেন যে লেনিন।

বিশ্বশান্তি পরিষদের আহ্বানে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ
১১।১২।৬০ তারিখে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুসরণে লিখিত।

কবিতাগুচ্ছ

তোমার নাম

চিত্ত ঘোষ

আমার কথার সমস্ত শক্তি উদ্যত করেছি
আমার অনুভবের সমস্ত বেদনা তোমাকে ঘিরে
আমার হৃদয়ের সবটুকু কোমলতা তোমার নামের ওপর রাখলাম।

মহৎ এক মৃত্যু যাকে অভিহিত করি অন্য জীবনের নামে
মহৎ এক জীবন যা শুদ্ধতার আলোকিত আবেগ
স্থির এক মুখ যা পীড়িত, প্রবল, আফ্রিকা—
তার চোখে, তোমার স্বপ্নের শিকড়ে
জল, জলধারা।

আমার দু চোখে আহত অরণ্য, গলিত পাহাড়
ওথলানো নদী আর বাদামী বালু আর সূর্য
আর তুমি, তোমার স্থির মুখ
আমি যেন আফ্রিকার স্পন্দিত মানুষ।

তোমার দেহের ক্ষতচিহ্নের দিকে আমি তাকাতে পারি না
প্রাচীন পীড়িত, প্রবল তুমি,
আফ্রিকা—
আমার কথার সমস্ত শক্তি উদ্যত করেছি
আমার অনুভবের সমস্ত বেদনা তোমাকে ঘিরে
আমার হৃদয়ের সবটুকু কোমলতা তোমার নামের ওপর রাখলাম

লুমুম্বা-মিছিল

মণীন্দ্র রায়

এই তো সেদিনও ছিল একটি মানুষ, নেই আজ,
চোখে তার আফ্রিকার কুমারী প্রেমের বিশুদ্ধতা,
বুকে দীপ্ত অরণ্যের সবুজের প্রাকৃত স্বরাজ—
আজ সে কোথায় গেল, থেমেছে কি তার সব কথা ?

জীবনে সে বীর ছিল, মরণে কি বিস্মৃতির তলে
নিরুদ্দিষ্ট সমাধির উদাসীন ঘাসের মৃত্তিকা
টেনে নিল তাকে ? শুধু বিন্দু দুই শোকাশ্রুর জলে
তৃপ্ত সে ? বাকী যা সবই বিতর্ক, প্রস্তাব, ভাষ্য, টীকা ?

…বরং হাওয়ার বুকে কান পাত, বরং তাকাও
অন্ধকার পৃথিবীর মূর্ছাতুর স্তব্ধতার পারে—
ও কার চিত্রার্পিত প্রতিমূর্তি নক্ষত্রউধাও
জেগে ওঠে ? ও যে তুমি ! চিনে নিতে পার কি তোমারে ?

জীবনে সে বীর ছিল, মরণে সে কারণসলিল :
তুমি আমি সকলেই তাই আজ লুমুম্বা-মিছিল ।

বিষাদ সন্ন্যাস

তরুণ সান্যাল

বাতায়নে দূরে একটি বাতি জ্বলছে, অস্পষ্ট মানুষ
কিংবা ফুল, ভাস্কর্য বা চিত্রগুলি ছায়া হয়ে দোলে,
স্তব্ধ অন্ধকারে আমি অরণ্যের জটিল প্রত্যূষ
চাই বলে বসে আছি ইতিহাসে, নিসর্গ ভূগোলে ।
আমাদের সময়ের ফুলগুলি পাথুরে চোয়ালে
বাটালির ধারে হয় মুখ, অশ্রু, সুন্দর বিষাদ,
ভালোবাসা কাছে এলে, বাকি রাত্রি গড়ালে, পোহালে,
ছিন্ন মাংসখণ্ড ছোঁবে কষায় জলের তিক্ত স্বাদ ।

হাতের তালুতে আছে কিণাঙ্ক দারুণ, কিন্তু আমি
একে ভালোবাসা মানি, কেননা, মানুষ, তার মুখ,
হাওয়ার উৎসাহে বড় কষ্ট পায়, পোশাকী ও দামী
সহাস্য সভায় হয় নিরুৎসুক চোখের কৌতুক ।
শুধু শোণিতের দাগে পিস্তলের গুলি, ছিদ্রগুলি,
আকাশে দর্পণে দেখে নক্ষত্রে ও আত্মদেহে মিল,
রক্ত, হিংসা পাশাপাশি, পোড়া ঘাসে অঙ্গার ও ধূলি
হাওয়ার উল্লাসে ওড়ে, নীচে নদী ধিক্কারে উর্মীল ।

নির্মল বাতাসে আমি হেঁটে যাব, প্রভাতের বায়ু
এস স্পর্শ কর, ধুয়ো জলধারা মেদ, চূর্ণ হাড়,
বয়সের বেড়াজালে আগুনে, দেয়ালে, পরমায়ু—
খেলা কোরো, মনে রাখি দ্রুত নৌকা আগুনের দাঁড় ।
দূরে বাতায়নে একটি ছুটি মূর্তি শতাব্দীর কাছে
চিনে নেয় ঋতুগুলি, কাণ্ডে ডালে পাতায় জটায়
জটিল সময় আছে বয়সের, বিস্ময়ের আঁচে,
আগামীকালের ঐ মহাদেশে রক্তের ফোঁটায় ।

মুখগুলি ভুলে যাই, নামগুলি লুপ্ত হয়ে আসে,
ছবিগুলি চতুর্দিকে আদিম অরণ্যে ছত্রাকার—
নদীর প্লাবিত ঘরে বসে থাকি বিষাদ সন্ন্যাসে
দূরে ফুল, ভাস্কর্য বা দেহগুলি নিহত চীৎকার।
গৃহবধূ, দূর পান্থ, অতিদূরে কোন বঙ্গবাসী
মাতাল অরণ্যে ছাখে জাগুয়ার, বন্ধনে প্রবীণ—
ঐ মাংস হাড় ঢাক, কষ্ট পাবে, লুমুম্বার হাসি
জলে উঠলে দিগ্বিদিকে, জলে উঠলে আমাদের দিন॥

সূত্রধার

অনিরুদ্ধ কর

বৃষ্টি এসে নিয়ে যায় বহুদূর জলের স্বদেশে ;

সংহত সমুদ্রবৃন্দ অগ্রথিত শব্দের মালিকা
নিয়ে আসে ;
কে গায় আর্তির গান সিক্ত এলোকেশে
কাকে উৎপীড়ন করে অপগত নিদাঘের শিখা।

(বালকস্বভাবে কেউ সাজিয়েছে অলীক সীমানা
ঘণ্টা বাজলে সাজঘরে ফিরে যায় অভ্যাসের মতো
যেন চুক্তি রক্ষা করতে সুখ-দুঃখ দৃশ্য আনে নানা
মানচিত্রে নামাবলী অনুরূপ মূঢ়তা-বিক্ষত।)

ছিঁড়ে পড়ছে জলমালা, চমকে ওঠে পৌরাণিক স্মৃতি
বিস্মৃত শপথে তুমি মত্ত আছ খণ্ডিত নাটকে ;
জল পড়ে বৃষ্টি পড়ে মনে পড়ে স্রোতের আকৃতি
দুঃখিত মীনের যাত্রা স্বদেশের প্রাথমিক শোকে।

প্রত্যহের মিথ্যা ছবি মুছে দেয় জলের লহর
অনাবৃত চিত্রপটে বর্ণস্রোত দীর্ঘ অবশেষে
এই চিত্রে লিপ্ত মীন চিরকাল উপাস্য ঈশ্বর
(সূত্রধার কথা বলে), বৃষ্টি পড়ে জলের স্বদেশে।

রবীন্দ্রনাথ

শংকর চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকারে নিমজ্জিত সবকটি দুর্গের তোরণ।
এমন সংহার কোথা কোনকালে দেখনি গরিমা
ক্ষমাহীন পটভূমি, শিল্প কত নিষ্ঠুরতা জানে
অভিশাপ বক্ষে বাজে, রক্তপাত স্খলিত পাষাণে।

কে তুমি আমাকে নাও বাহুপাশে তৃষিত উদ্ধত
ভীষণ ফুটন্ত দাহ, দগ্ধ হই বিষণ্ন একাকী
রুধিরে ফোটাই পুষ্প ক্ষয় লাগে অন্তিম পাষাণে
মূলে বিদ্ধ ঝর্নাগুলি কে রেখেছ অবারিত করে।

ভোজ্য হই সর্বনাশে, গ্রাস করে জাগ্রত চেতন
বিদ্যুৎ ক্ষেপণ করে পরাভূত চিরন্তনী ক্ষুধা
নিরিক্ত আমার মর্ম, পরিণামহীন অসঙ্গত
হৃদয়ের পার্শ্বে থেকো সমর্পণে আমি হই নত।

রঘু ভটচাজ্যির খাঁড়া

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

কোন বিকেল থেকেই কুয়াশা জমছিল। তায় আবার ডানা ছড়িয়ে ধুঁকছে পড়ে পড়ে সেই কোন যুধিষ্ঠিরের আমলের কটা বট-তেঁতুল গাছ। বেলা না পোয়াতেই দম নিভিয়ে কানা কানা গোটা রাজ্যিটা। তাই-ই তো। বেশাই ঠাকুরের মন্দিরের চুড়োতে তখনও লাল রোদটুকু লেপটে রয়েছে না।

নাও কথা! কোথাকার হাভাতে জুটল এসে, বলে, বেশাই ঠাকুর কে? চোখ টিপে ঠোঁট টিপে হাসল খেঁদী-পেঁচী মানুষ কটা। জিজ্ঞেস করছে বেশাই ঠাকুর কে! কে আবার। কেন, চেহারায় মালুম হয় না। চিকন কালো দত্যিপানা মানুষটা কি আর একালের গো। সেই-ই কবেকার। কলিতে কি আর এমন মানুষ জন্মায় কখনও। ওমা মানুষ কে গো! দেবতা। দেবতা। কোন আত্তিকালে অজন্মার সময় আপনার রক্ত দিয়ে বাঁচাল দেশ বিঁভুইয়ের লোকগুলোকে। ওনার পুণ্য রক্তেই না কি তুষ্ট হলেন মড়কচণ্ডী। তাই বুঝি এমন বরটা পেয়েছিলেন দেবতাদের কাছে।

লোকটা এক চিলতে দেখে নিল ঠাকুরকে। কানা কানা অন্ধকারে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে একটা পিদিম জ্বলছিল বুঝি। আলোটা ভেঙ্গেচুরে কাঁপছিল কখন থেকে। আর বেশাই ঠাকুর। এই কালো পাহাড়টার মতনই চেহারা, কপালময় সিন্দুর ল্যাপটানো। চেটো দুটো ডগডগে লালচে। যেন কাঁচা রক্তে থাবলা দিয়ে বসেছিল একটু আগে। সাদা চোখ দুটো বুঝি অন্ধকার চিরে জ্বলছিল ধ্বিকি-ধ্বিকি। ভয় হয় বইকি! লোকটারই বা দোষ কই? ভিন গাঁয়ের মানুষ। ও কি আর বেশাই ঠাকুরকে দেখবার জন্যে দু-দু ক্রোশ পাড়ি ঠেঙ্গিয়ে এসেছে। আসলে খেলা দেখতে এসেছিল লোকটা। সেই যে বেভুতিচরণ না কি নাম যে গো লোকটার। নিজেরই ডবকা ছেলেটাকে দু টুকরো করে দেয়। আস্ত জিভটাই কেটে নেয়। হেই মা গো! ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল লোকটা।

"আগে মানুষ বলি হত।" কে এক বুড়ো ফিসফিস করে বলল। যেন নিজের চোখেই ঘটনাটা দেখেছে সেদিন, "বেশাই ঠাকুর বর পেয়েছিল কিনা।

ফি বছর এই সময়টায় পরিচিত মানুষজনা রক্ত দিয়ে ওনার ঋণ শুধে যাবে জন্ম জন্ম।"

"কখন আসবে গো বিভূতি?"

"এই এল বলে।"

লোকটা আর স্থির থাকতে পারছিল না।

বেদীর সামনে পুরুতঠাকুরের পাতলা চেহারাটা বুঝি আবেশে দুলছিল থেকে থেকে। বিড় বিড় মন্তর পড়ছিল কেমন। অথৈ অন্ধকারে কটা স্রোতের মতো দুলছিল স্বরটা। চন্দন সিঁদুর জ্যাবড়ানো অপার্থিব মুখচোখ। কে যেন কবে কোন যুগে মন্দিরের অন্ধকারে মুখটা এঁকে দিয়ে পালিয়েছিল কোথায়। আজও সেখানে তেমনি পড়ে রয়েছে ছবিটা।

এক পাশে পালা জালিয়ে কটা যোয়ান বুড়ো শীত থামাচ্ছিল। গনগনে আঁচে ছায়াগুলা লম্বা লম্বা আঙ্গুল ছড়িয়ে নড়ছিল থেকে থেকে। কে এক গুচ্ছের পাতা কুড়িয়ে ঢেলে দিল আগুনটায়। দপ করে তেজালো হয়ে গেল জায়গাটা। মন্দিরের চাতালময় তাত উপচে পড়ল। মানুষজনদের ছায়াকটা টালমাটাল কাঁপছিল আঁচে। ভূমিকম্পর মতো মনে হচ্ছিল যেন।

কে এক মাতব্বর এসে খসর খসর করে সামনের চাতালটা ঝাঁট দিতে লাগল। ধুলোয় ধুলোময় জায়গাটা। মানুষজন কাশল খুক খুক করে। তিন-চারটে কারবাইডের বাতি কে বসিয়ে দিয়ে গেল সামনে। লণ্ঠনগুলো এতক্ষণ টিমটিম জ্বলছিল কোনমতে। এখন চোখ ঢাকল যেন। খড়ি-ফোটা আলোতে ডুবু ডুবু চাতালটা। চটলা ওঠা মান্ধাতার যুগের হাঁড়িকাঠটাতে চোখগুলো পড়ল সবার। সিঁদুর আর রক্তের দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে যাওয়া কাঠটার চারপাশে কিছু তাজা জবাফুল আর বিল্বপত্তোর চড়ান।

"কই গো, বিভূতি এল কই?"

"হুঁ।" পাশের জনা কি ভাবছিল কে জানে, "বলির পরই তো খেলা।" জোর জোর মাথাটা ঝাঁকাল কবার।

গোটা তিন সাদা কালো ছাগলকে একজন হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল। একটা লম্বা রশি দিয়ে সামনের থামটায় বেঁধে দিল। উটকো ছাটকা ছেলে এসে ঘিরে বসল চারপাশে। পাতা এটা-সেটা ছুঁড়ে দিচ্ছিল মুখের সামনে। তাইতেই হুটোপুটি বেধে যাচ্ছিল তিনটের মধ্যে। একটা পুঁচকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল সাদাটার ঘাড়েগদ্দানে। 'ম্যা ম্যা' করে সেটা

ডেকে উঠল কবার। বাতি-কটা ফিনকি দিয়ে জ্বলছিল। ছাগলকটার চোখগুলো ছলছল মতন।

"এয়েছে রে। বিভূতিচরণ এয়েছে।"

বিজ বিজ করে একটা ঢেউ উঠল। প্যাটরা পুঁটলি বাগিয়ে বিভূতি যে কোণটায় গিয়ে বসল তার আশপাশে মানুষ জমল পিলপিল করে। ওই তো যোয়ান ছেলেটা। বিভূতি নিত্য কেটেকুটে একশা করছে সারা শরীরটা। কটা পুঁচকে ছায়ার মতো পাক খাচ্ছিল চারপাশে। সাহসী দু-একটা আগু-বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করছিল এটা-সেটা। জবাব দিচ্ছিল না ছেলেটা। বুক চিতিয়ে বসে ছিল মাঝটায়। ভারী ভারী চোখ থমকে দেখছিল বলির ছাগল কটাকে।

বলির পরেই খেলা।

বাতি-কটা জ্বলছিল তীব্র হয়ে। 'ম্যা ম্যা' করে একসঙ্গে ডাক পাড়ল সব কটা ছাগলই। সবকটার লোম বেয়ে বেয়ে টপটপ জল গড়িয়ে পড়ছিল শানটায়। রঘু ভটচাজ্যি একটা উঁচু পাথর খুঁজে নিয়ে ভারী খাঁড়াটায় শান দিচ্ছিল ঘসে ঘসে। আলো চমকাচ্ছিল ফলাটার কানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। রঘু ভটচাজ্যি দৈবপুরুষের মতো ঘাড় গুঁজে বাবড়ি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে শানাচ্ছিল ফলাটা।

"কত ভারী জানিস ওটা।" পাশ থেকে চাপা চাপা বলল একটা ছেলে। সঙ্গী ছেলেটা জবাব দিল না। একমনে বোকার মতো ভীরুর মতো দেখছিল খাঁড়াটা।

পুরুতঠাকুর উঠানটায় নেমে এল। কটা টকটকে লাল জবা আর বিল্বপত্তোর গুঁজে দিল ছাগলকটার কানে শিঙে। গম্ভীর গলা কাঁপিয়ে মন্তর পাঠ করছিল বিড়বিড় করে। সবকটারই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা কেটে দিল টিপে টিপে। সাদা-কালো শরীরে সিঁদুরের মোটা দাগগুলো জ্বলছিল ধ্বিকিধ্বিকি। পূজার বেদীটার চারপাশে কানা কানা অন্ধকার। বেশাই ঠাকুরের সাদা চোখ দুটো জ্বলছিল অন্ধকার চিরে।

কাপড়ে মালসাট মেরে শরীরটা টান করে ছড়িয়ে হেঁকে উঠল রঘু ভটচাজ্যি, "জয় বাবা বিশাই।"

ডাকটা হঠাৎ ঢেউ তুলে অন্ধকারে পিছলে পড়ে আবার নিভে গেল। অন্ধকার যেন শুনে নিল ডাকটা। বাবড়ি ফোলানো দৈব পুরুষের মতো ভারী মাথাটা দুলছিল আবেশে। ঢুলুঢুলু চোখ দুটো মায়া-ঘেরা মায়া-ঘেরা।

ঢাকীরা কাঠি সামলে ঝুঁকে গেল সামনে। একটা কুত্তা ল্যাজ তুলে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল সামনেটায়। দম বন্ধ করে মানুষগুলো লেপটে গেল খুঁটির চারপাশে। হাড়িকাঠের সামনে পুরুতঠাকুর একটা বড় খুরিতে কলা বাতাসার ভোগ সাজিয়ে রেখে গেল। কাটা মুণ্ডুটা কেউ উপুড় করে ধরবে। ভল ভল করে রক্ত জমা হবে খুরিটায়। বেশাই ঠাকুরের ঋণশোধ। কুত্তাটা ল্যাজ নাচাল বার কয়েক।

"আগে নরবলি হত।"

ফিসফিস করে বলল কে যেন।

দুপাশ থেকেই দুজন একজন তিনজনে মিলে টানটান করে ধরল ছাগলটা। কবার ঝটপট করে এলিয়ে গেল সেটা। একজন আরো চেপে ধরল মুখটা। মিনমিন করে কাঁদল ছাগলটা। তার সব স্থির।

"জয় বাবা বেশাই ঠাকুর।"

হাঁকটা ঝাপটা তুলে ঘন হয়ে গেল অন্ধকারে।

খাঁড়া সুদ্ধু হাতদুটো টানটান করে উপরে তুলল রঘু ভটচাজ্যি। বেশাই ঠাকুরের দুচোখ চিকমিক করছিল অন্ধকারে। ফঁস করে ভারী নিশ্বাস ফেলল বিভূতিচরণ। ঝলকিয়ে ছিটকে পড়ল খাঁড়াটা। কটা বাচ্চা ভয়ে চোখ বন্ধ করে দিল। এক সঙ্গে বেজে উঠল ঢাক কাঁশিগুলো। কাটা ধড়টা ঝটপট করছিল মাটিতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল খানিক। শুকনো জায়গাটা ভিজে গেল অনেকখানি। ফঁস করে নিশ্বাস পড়ল বিভূতির। মাটি ভিজে কাদা কাদা। কুত্তাটা কবার ভীড় ঠেলে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করল। না পেরে মাটি শুঁকতে লাগল ল্যাজ নেড়ে নেড়ে।

বলির পরেই খেলা।

আর, খেলা শুরু হল।

সামনের ছড়ানো জমিটাতে তৈরি হচ্ছিল বিভূতিচরণ। এদিক সেদিক বুড়ো বট-তেঁতুল কটা ড্যানা ছড়িয়ে অন্ধকার ভারী করে রেখেছিল। দুটো কারবাইড বাতি আসতেই অন্ধকার মুছে গেল। কেবল ঝুপসি বট-তেঁতুলকটা উবু হঁাই দত্যির ঢঙে থমকে ছিল। বিভূতিকে মনে হচ্ছিল গপ্পের সেই যাদুকরটা। পুঁটলি থেকে একটা ফাটা খুলি আর কটা হাড় বার করে নামাল সামনেটায়। চারপাশে লোকদের নিশ্বাস পড়ছিল খুব

আস্তে আস্তে। যেন কেউ মন্তর পড়ে দিয়েছে সবাইকার মুখে চোখে। ভয় ডুবুডুবু সব্বাইকার মুখ চোখ। বিভূতির মদ্দ ছেলেটা বসেছিল কেমন এক রকম মুখ করে।

"আমার একটিই ছেলে সিদ্ধিনাথ। বাবা বেশাইঠাকুর জানেন ও ও আমার এক ছেলে।" বেশাই ঠাকুরের দিব্যি পাড়ল বিভূতি। মানুষগুলো একবার চমকে ভয়ে ভয়ে দেখল বিভূতিকে।

"সিদ্ধিনাথকেই আপনাদের সামনে কেটে দু টুকরা করব। জ্যান্ত ছেলেটার জিভ কেটে ফেলব আপনাদের সামনেই।"

বিশ্বাস হয় না। সবাই তাকাল সন্দেহে। বিভূতিচরণকে মনে হচ্ছিল সেই রূপকথার যাদুকর। বিড়বিড় কথা বলছিল বিভূতি। যেন কোন একটা অচেনা জায়গা থেকে উঠে আসছিল শব্দকটা। আর বিভূতি। কারবাইডের স্থির আলো জমছিল মুখময়। হঠাৎ এক ধরনের চেহারা হল বিভূতির। কেমন রঙচঙে অচেনা একটা মুখ। যেন ভর করেছে কেউ। ভয় হয় দেখলে। কারবাইডের তাতে মাজা-মাজা কিম্ভূত একটা মুখ। মন্তর-তন্তর জানা নেই—লোকটা যেন ইচ্ছে করলে এক ফুঁয়ে সবকটা মানুষকে ধুলো করে দিতে পারে।

"সিদ্ধিনাথকে কেটে দুভাগ করব আপনাদের সামনেই।"

একটা হলুদ হাড় ছেলেটার মাথায় পায়ে বুলিয়ে নিল বিভূতি। ভয় থমকানো লোকগুলা যেন জমে গেছিল সব। কেবল বিভূতিচরণের গলার স্বর ভেসে আসছিল অনেক দূর থেকে।

সিদ্ধিনাথের লাসটা চাদর ঢাকা পড়েছিল সামনে। বিভূতিচরণের হাতের অস্তোরটার গা বেয়ে বেয়ে আলো গলছিল যেন। কার কোলের ছেলেটা হাউমাউ করে উঠল ভয় পেয়ে। ফাটা খুলিটা পড়েছিল সিদ্ধিনাথের মাথার সিথানে। ইচ্ছে করলে খুলিটাকেই হাঁটিয়ে দিতে পারে বিভূতিচরণ।

"জয় বাবা বেশাই ঠাকুর।"

অবাস্তব গলায় হেঁকে উঠল বিভূতি। পাখা সাপটানর মতো মিলিয়ে গেল হাঁকটা। কুত্তাটা তখনও ল্যাজ নাড়ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। এখানটা থেকেও চেনা যায় বেশাই ঠাকুরের চোখ দুটো। অন্ধকার কেটে ফুটেছিল। স্পষ্ট জ্বলছিল দপ দপ করে। ঝুঁকে পড়ল সব কটা লোক। ভয়চুবোন মুখচোখ। বিভূতির হাতের অস্তোরটা কবার আলো চলকিয়ে সাঁৎ করে নেমে এল নিচে।

দম বন্ধ করা মানুষকটার বুকে পাথর পড়ল হঠাৎ। খ্যাচাং করে ছেলেটাকে দুভাগ করে দিল বিভূতিচরণ। মুণ্ডুটা অনেক সরিয়ে দিল ধড় থেকে।

দু পাশের লোককটা ভয়ে বিস্ময়ে থ মেরে গেল। বিভূতিচরণের ভঙ্গিমাটা কেবল অচেনা অচেনা। একটু আগের-দেখা মানুষটা যেন একেবারে অন্য কেউ। চোখ দুটো টান টান ছড়ানো। মুখটা পাথরের মতো নিরেট ভারী। শব্দকটা বুজকুড়ির মতো উঠে আসছিল অতল অন্ধকার থেকে। কটা জোনাকি এসে আসরের চারপাশটিতে ঘুরছিল জলছিল। কুয়াসায় শীতে মধ্যে মধ্যে সব্বাই কাঁপছিল ঠকঠক করে। কটা পুরনো বট পাতা ভেরুলের মতো পাক খেতে খেতে উড়ে এসে পড়ল আসরে।

আশ্চর্য! একেবারে দুফাঁক করা মানুষটা জুড়ে দিল বিভূতি। মরা মানুষটা যেন হঠাৎ জেগে উঠে অবিশ্বাসী চোখ পিটপিট করে দেখছিল সবাইকে। ভয়ে মুখ কাচুমাচু করে তাকাল লোককটা। ছেলেটা কি কাণ্ড করে বসে কে জানে! দু চোখে আকাশ ছ্যাদা করে হাঁক পাড়ল বিভূতি।

"জয় বাবা বিশাই ঠাকুর।"

রঘু ভটচাজ্যিও কখন গুটিসুটি এসে দাঁড়িয়েছিল আসরে। সেই দৈব-পুরুষের মতো বিরাট চেহারা। ফোলানো ফাঁপরা চুলের নিচে মুণ্ডটা চোখগুলো কেমন নেশাময় আচ্ছন্ন। গায়ের এখানটায় ওখানটায় খানিক ছিঁটেফোঁটা রক্ত জমে কালচে মেরে গেছে। কারবাইডকটা দপ দপ জলছিল। আসরের মানুষকটার মুখচোখ কে যেন ভয়ে ছুপিয়ে রেখেছে।

বিভূতিচরণের ডুগডুগিটা মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ করে বাজছিল। কটা জোনাকি ভাসছিল সামনেটায়। পেছনেই মন্দিরের উঠোনটায় থমকানো অন্ধকার। মাটিতে তাদের ছায়াগুলি অদ্ভুত রকমের। মাথাগুলো ঝিমঝিম করছিল সব্বাইকার।

আরে আরে সব্বোনাশ! আধমরা ছেলেটার সামনে উঁচু হয়ে বসে ওর আস্ত জিভটা কেটে দিল বিভূতি। মানুষজনেরা নিশ্বাস থামিয়ে দেখছিল। আঙ্গুলের ডগা চুঁইয়ে কটা রক্তের ফোঁটা সরসর করে নামছিল কনুই অব্দি। তাজা লাল রঙটা। বিভূতিচরণের গলার স্বরটা পালটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কোন অতল অন্ধকার থেকে কটা বুজকুড়ি উঠে আসছিল বিজবিজ করে। লোকজন কটা ভয়ে লোভে পাথর হচ্ছিল কখন থেকে। কেবল রঘু ভটচাজ্যি বিড়বিড় করে বলে উঠল এক সময়, "অবিকল লাল রঙটা।"

আরো কটা পাতা উড়ে এসে পড়ল আসরে। একটা ঝিঁঝিঁ হঠাৎ কান্না শুরু করে দিল কোথা থেকে। কার বাচ্চাটা হঠাৎ চাপা স্বরে বলে উঠল, "বাড়ি যাব।"

"দূর ভয় কি বোকা! আরো কত খেলা দেখবি এখন।" ধমকাল কে বাচ্চাটাকে।

চারপাশের মানুষজনকে একবারটি দেখল বিভূতিচরণ। ভয়ে লোভে কেমন যেন সবকটা মুখ। বাতির আলো পড়েছিল সব্বাইকার মুখে। রঙ করা মাটির-মুখের মতন। পুরনোকালের কটা ধার্মিক মানুষ যেন কখন জেগে উঠল মাটি ফুঁড়ে। আর বিভূতিচরণ সেই বলিটা। ফঁস করে এতবড় একটা নিশ্বাস ফেলল বিভূতি। ঝিঁঝিঁটা কাঁদছিল কঁকিয়ে কঁকিয়ে। আর সিদ্ধিনাথ অদ্ভুত একরকম মুখ করে বসেছিল মাচাটায়।

লম্বা রশিটা বার করল বিভূতিচরণ। সন্দেহে সন্দেহে একবার দেখল চারপাশের মানুষগুলি। ফাঁস বেঁধে গলায় পরল বিভূতিচরণ। রশিটার দুটো মাথা ধরল কজন মিলে।

"হেই বাবা বেশাই ঠাকুর।"

হ্যাচকা মেরে টান দিল লোক কজন। আরো জোরে। ফাঁসটা চাপ হয়ে বসে যাচ্ছিল গলায়। দম বন্ধ করে গলাটা কাঠ করল বিভূতিচরণ। রগের শিরা দুটো টানটান হয়ে ফুটে উঠল। রক্ত ছলাৎ করে উঠে এল মাথায়। ঝিঁঝির কান্না স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে ডুবে যাচ্ছিল অন্ধকারে। জোনাকির মতন শয়ে শয়ে ফুল কেটে উঠল অন্ধকারটা। ফটফট করে কবার ঝাঁকি মেরে কারবাইডের তেজটা ঝাপসা হয়ে যেতে যেতে দপ করে নিভে গেল একসময়। মাথায় রক্ত ফুটছিল টগবগ করে। মানুষকটা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে যেতে আবার ফুটে উঠল চোখে। পাতলা হয়ে-যাওয়া বাতি কটার আলো আবার কেটে কেটে জাগছিল অন্ধকারে। মাটিটা টাল খাচ্ছিল খুব আস্তে আস্তে। ঝিঁঝির কান্নাটা পাতলা হয়ে বাজছিল কানে। আর ভয় সন্দেহ মাখানো দুটো চোখ মেলে কি যেন দেখছিল বিভূতিচরণ। সেই কোন আদ্যিকাল থেকে পৃথিবীটা চাপ-চাপ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ছায়া জমানো কিম্ভূত কটা পৌরাণিক পুরুষ তর্জনি তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে। আর, বিভূতি যেন সেই বলিটা।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

মৃত্যুশিবিরে জীবনের স্ফুলিঙ্গ

সুমন্ত্র চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক সাহিত্যে উপজীব্য বিষয় হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্বাভাবিকভাবে
বিরাট স্থান অধিকার করেছে ; ব্যক্তিগত বীরত্ব, সমগ্র জাতির অদম্য মনোব
ও প্রতিরোধ, ফ্যাশিস্ত শাসনের ভয়াবহতা, যুদ্ধের সর্বাত্মক অপচয়—নান
দেশী লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এর কোন না কোন দিক স্পষ্ট কর
তুলেছেন। তবু এখনো কোন কোন দিকে ঘাটতি আছে বলে মনে হয়
আমি ফ্যাশিস্ত বন্দীশিবিরগুলোর কথা বলছি। ছোটবড় অসংখ্য নরকে
লক্ষ লক্ষ নরনারী যে মৃত্যুস্নান করেছে তার কথা যুদ্ধ-সাহিত্যে যথাযোগ
স্থান পায় নি। এ নিয়ে যে সাহিত্য আজ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তাতে বন্দী
শিবিরের ভয়াবহতাই প্রধান হয়ে উঠেছে ; ভয়ংকর নরকবাসের মধ্যে
বন্দীদের অটুট একতা, মনোবল, সংগ্রামী চেতনা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসে
দিকটা গৌণ হয়ে গেছে। অথচ দীর্ঘকাল এই অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে
থেকেও তাদের মনুষ্যত্ব মুছে যায় নি ; দৈনন্দিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
তারা সংগ্রাম করেছে। প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে
তার মধ্যেই চলেছে চূড়ান্ত আঘাতহানার প্রস্তুতি। মার্কিন বাহিনী বুকেন
ওয়াল্ড শিবিরে পৌঁছে একজনও সশস্ত্র নাৎসী প্রহরীর সন্ধান পায় নি—
শিবির তখন বন্দীদের হাতে, আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ সংগঠন তার নেতৃ
করছে। একথা সত্যি যে মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত না হলে এ
সম্ভব হত না, আবার এও সত্যি যে বন্দীরা শেষ আঘাত হানবার সাহস
ক্ষমতা অটুট রাখতে পেরেছিল। বন্দশিবিরগুলোর ইতিহাস মানুষের প্রতি
আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা গভীরতর করে। আলোচ্য উপন্যাসটি বুকেনওয়া
বন্দীশিবিরের অমর সংগ্রামের উজ্জ্বল চিত্র।

১৯৩৩ সালেই নাৎসীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটো গান হল

When Jewish blood spurits from under the knife,
Things will be twice as good as before.

আর,

The red brood, beat them to a pulp !
Storm troops are on the march-clear the way !

এই মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি ছোটবড় অসংখ্য বন্দীশালা। ১৯৩৩ সালেই অন্ততঃ চল্লিশ হাজার বন্দী ভীড় করেছে সেখানে। ১৯৪৫ পর্যন্ত সেই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেছে ; মরিয়া ফ্যাশিস্তদের পাশবিকতার মাত্রাও পৌঁছেচে শেষ সীমায়। ১৯৩৩ সালে বন্দীশিবিরের এক কর্তাস্থানীয় ব্যক্তির মন্তব্য : It will be a long while before many of the prisoners get their freedom, for the will of the prisoners is not easy to break। ১৯৪৫ সালে যে সব বন্দীর সাক্ষাত পাই তাদের অনেকেই দীর্ঘ বারো বছর নরকবাস করেছে, তাদের মনোবল তখনও ভাঙে নি। শুধু জার্মান নয়, রুশ, পোল, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ—নানা জাতির মানুষের দেখা মেলে ১৯৪৫ সালের বন্দীশিবিরগুলোতে। বুকেনওয়াল্ড অতিকায় শিবির, ভয়াবহতায় এর জুড়ি নেই।

সালটা ১৯৪৫—মার্কিন বাহিনী রাইন পার হয়েছে, পূর্ব সীমান্তে লাল ফৌজের অগ্রগতি। হিটলারের পতন আর মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। টুকরো টুকরো খবর পায় বন্দীরা, বাকিটা কল্পনা করে নেয়। শিবিরের কর্তৃপক্ষের মধ্যেও আসন্ন পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পঞ্চাশ হাজার বন্দীর প্রত্যেকের মনে একই চিন্তা—আর কয়েকটা দিন টিকে থাকতে পারলেই মুক্তি। সতর্কভাবে অপেক্ষা করছে গোপন প্রতিরোধ সংগঠন—চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আশা-নিরাশার মধ্যে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বাইরে মড়া-পোড়ানো ঘরের চিমনির ধোঁয়া আকাশ কালো করছে, নাৎসী প্রহরীদের চাবুক ক্ষণে ক্ষণে লিকলিকিয়ে উঠছে, রিভলভার ফণা নামায় নি। কিন্তু ভেতরে নাৎসীরা অস্বস্তি ভোগ করছে, ধরা পড়লে কি হাল হবে বুঝতে পারছে না, কোন্ পথে পালানো যায় হিসেব করছে। এই অবস্থায় শিবিরে একটা ঘটনা ঘটল ; পঞ্চাশ হাজার মানুষের প্রায় কেউ জানতে পারল না, কিন্তু এই ঘটনার ফল হল সুদূরপ্রসারী।

নতুন আমদানী পোল বন্দী জ্যানকোস্কি হাতের স্যুটকেশ হাতছাড়া

করবে না। মৃত্যুর নিঃশ্বাস যেখানে সর্বদাই ঘাড়ে অনুভব করতে হচ্ছে, সেখানে এই "ইহুদীসুলভ" সতর্কতা হাসির খোরাক। দুজন বন্দী সন্তর্পণে ডালা খুলে হতবাক হয়ে যায়; মণিমুক্তো নয়—In the suitcase, huddled together, its little hands pressed to it face, lay a child wrapped in rags। বছর তিনেকের একটা ছেলে—naked among wolves। জ্যানকোস্কি তার কেউ নয়; তিন মাস বয়সে ছেলেটা বাবা-মাকে হারিয়েছে হিটলারের কল্যাণে। জ্যানকোস্কি ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "...little child don't know what is human being. It only knows what is SS and what is prisoner।"

জ্যানকোস্কির কাছে রাখলে এর অবধারিত মৃত্যু—যম একগাল হেসে বলবে, "Oh look, do look, what some one's brought me!" আবার দায়িত্ব নিলে ঝুঁকি নেওয়া হয়, ঝুঁকি শুধু ব্যক্তিগত জীবনের নয়, গোপন সংগঠন ধরা পড়ার ঝুঁকিও বটে। কিন্তু দায়িত্ব এড়ানো যায় না, কারণ এই-শিশু বন্দীদের হারানো দিনের প্রতীক, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবনমরণের দায়িত্ব গোপন সংগঠনের; একটা শিশুর জন্যে বিপন্ন হবে এতগুলো মানুষ, এটা হতে পারে না। নেতৃত্ব তাই নির্দেশ দেয় শিশুটিকে জ্যানকোস্কির কাছে দিয়ে দাও, কোনো উপায় নেই। কিন্তু গোপন সংগঠনের দায়িত্বশীল কর্মীও নির্দেশ অমান্য করে, ছেলেটা শিবিরে ঠাঁই পায়। তার পর ঘটনাস্রোত অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। ১৯৪৫ সালের ১১ই এপ্রিল মুক্তির ক্ষণ পর্যন্ত বিচিত্র ঘটনাবলীর চিত্র লেখক এঁকেছেন।

এই শিশুটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে; বুকেন-ওয়াল্ডের সামগ্রিক জীবনের চিত্র ফোটাবার চেষ্টা লেখক করেন নি। তা বোধ হয় অসম্ভব হত। কিন্তু এই শিশুটির নিরাপত্তার সংগ্রাম এবং শিবিরের বন্দীদের জীবনের সংগ্রাম এক সূত্রে বিধৃত করতে পেরেছেন তিনি। "মৃত্যু-শালার সীমান্ত অতিক্রম করে যে জীবন-স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসেছে," নরপশুরা যাতে তাকে মাড়িয়ে না যেতে পারে সেই চেষ্টায় যারা মরণপণ করেছে, তাদের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ অনেক মানুষের ছবি এঁকেছেন লেখক। সংগঠনের সামরিক শিক্ষক হফেল, সাধারণ বন্দী রোজ, পিপ্লিগ, সংগঠনের নেতা জার্মান বোচাও আর রুশ বগরস্কি, ক্রামার, করপিন্স্কি এবং আরও

অনেকে তাদের বেদনা, দ্বিধা, আশা, নৈরাশ্য, দায়িত্ব ও বিবেকের অন্তর্দ্বন্দ্বে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নানান দেশের নানা শ্রেণীর মানুষের মন একসূত্রে বাঁধা পড়েছে:

Oh Buchenwald, we will not pine or sorrow
No matter what the future yet may be.
We sing for life, we sing the new tomorrow,
For when tomorrow comes, we will be free.

জার্মান ফ্যাশিস্তদের মরণবেলার মনোবৃত্তির পরিচয় পরিষ্কার হয়েছে কয়েকটা চরিত্রের মধ্যে—রাইনবথ, জোয়াইলিং, স্থল, ক্লুটিগ ইত্যাদি চরিত্র তার নানা প্রতিক্রিয়াকে স্পষ্ট করে তুলেছে। আসন্ন পরাজয়ের মুখে সর্বগ্রাসী ভয় আর অপরাধের বোঝা তাদের দিশেহারা করে ফেলেছে। লেখক ব্রুনো আপিৎস্ বুকেনওয়াল্ডে বন্দীজীবন কাটিয়েছেন দীর্ঘ দিন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর প্রধান সম্বল, মানবতার প্রতি অটুট বিশ্বাস তাঁর পাথেয়। অত্যাচার ও প্রতিরোধের একটি সুসমঞ্জস চিত্র তুলে ধরতে তাই তিনি সফল হয়েছেন।

এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। ত্রুটি কিছু কিছু না ঘটেছে, তা নয়। বন্দীদের পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের অবকাশ নিশ্চয়ই ছিল, যেমনটি তিনি করেছেন অংশত হফেল এবং রোজের বেলায়। এর জন্যেই হফেলের সংগঠনের নির্দেশ অমান্য করা এবং রোজের অত্যাচারের মুখে ভেঙে পড়া বিশ্বাসযোগ্য ও মর্মস্পর্শী হতে পেরেছে। এর আশ্রয় নিলে নানা মনের ঐকতান জমে উঠত এবং চরিত্রগুলি আরও জীবন্ত হতে পারত। ভাষা মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়েছে, এ বোধ হয় অনুবাদের দোষ। কিন্তু তিনি যা সম্ভব করেছেন তার পাশে এ ত্রুটি খুব মারাত্মক নয়—তাঁর অন্যান্য রচনার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

সাহিত্যমূল্য ছাড়া অন্য কারণের জন্যও এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কাম্য। জগতের বিবেকবান সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত হয়ে ফ্যাশিজমের পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করছে। বুকেনওয়াল্ডের খুনী সোমার (যে নিজের হাতে ১৮৭ জনকে গুলি করে মেরেছিল) পশ্চিম জার্মানীতে বহাল তবিয়তে বাস করছে; হিটলারের সেনাপতি স্পাইডেল ন্যাটোর অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ; এগারো হাজার বুলগেরীয় ইহুদী হত্যার জন্য দায়ী বেকের্ল কোনো শাস্তি পায় নি; হিটলারের মন্ত্রী

স্নেগেলবার্গার সরকারী পেন্সন পাচ্ছে ; নাৎসী জানোয়ার জিরপিন্দ পশ্চিম জার্মানীতে পুলিস অফিসার ; আইকম্যানের গ্রেপ্তারের পর মন্ত্রী হান্স গ্লোবকের কাণ্ডকারখানায় সরকারী উপরমহলে নাৎসী রাজত্বের প্রমাণ মিলেছে। আদেনিউর সরকার ঘোষণা করেছে (৮ই মে, ১৯৬০) হিটলারী শাসনের অপরাধের জন্য আর কাউকে অপরাধী করা হবে না—তার মানে যে সব নরপশু আত্মগোপন করেছিল তারা আত্মপ্রকাশ ও নির্ভয়ে বাস করবে। হিটলারের দ্বিতীয় গ্রন্থ সরকারী সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং বন সরকার পুস্তক প্রদর্শনীতে এ বইটাও দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। ফ্যাশিজমের এই পুনরুজ্জীবনে পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বুকেন-ওয়াল্ডের বন্দীরা মুক্তির পরে এক শপথ গ্রহণ করেছিলেন—We, united by Buchenwald, this symbol of the sufferings of the peoples, swear we shall fight in everyway against those who would build the death camps and employ weapons of mass extermination. We swear to fight with all our strength against the return of the executioners—their masters, their leaders, their comrade-in-arms—in order to prevent the enslavement of the peoples। এত শীঘ্র যে সেই শপথ পুনরায় স্মরণ করতে হবে তাঁদের কেউই বোধ হয় তা ভাবতে পারেন নি।

Naked Among Wolves by Bruno Apitz—Seven Seas Book. Rs. 2.50 nP. (Distributors : National Book Agency (P.) Ltd.)

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (১ম পর্ব)॥ জীবেন্দ্র সিংহ রায়। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। আট টাকা॥

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নব-জাগরণ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত। এ মুখার্জি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ। সাত টাকা॥

শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় এবং শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত বাংলা সাহিত্য বা বাঙালী জীবনের যে অধ্যায় নিয়ে এই গ্রন্থ দুখানিতে আলোচনা করেছেন সে অধ্যায় নিয়ে অতীতে এবং বর্তমানে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনার মাল-মশলা এত প্রচুর যে, পরিবর্জন নির্বাচন না করে, সব তথ্যের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমাবেশ ঘটিয়ে, একটি সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছব, এ কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব তো করতে পারেনই না ; মাঝখান থেকে তাঁদের বিচার না হয় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, না হয় ব্যক্তি-সাপেক্ষ ; মানে কিছুই হয় না। এ বিষয়ে জীবেন্দ্রবাবু সচেতন। তাই তিনি গ্রন্থের ভূমিকাতেই তাঁর দৃষ্টিকোণের বিষয়ে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। আর তাঁর গ্রন্থের নামেই এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি বাংলাদেশে, ঐ যুগে, সাহিত্যের বিকাশের ধারাই অনুধাবন করেছেন মুখ্যত ; সেই সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তিভূমি তাঁর আলোচনার শুধু সহায়ক মাত্র। সেই ধারার শুরু রামমোহনে। তিনি অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আসেন নি —বলেছেন পরের খণ্ডে আসবেন।

রামমোহন থেকে রঙ্গলাল পর্যন্ত আলোচনায় জীবেন্দ্রবাবুর বৈশিষ্ট্য নূতন সাধারণ সত্য আবিষ্কারে নয়, নূতন তথ্য পরিবেশনেও নয়, তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যুগের যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রের নিয়ামক তাঁদের ব্যক্তিগত কৃতির আলোচনায় এবং কৃতির ধারা নিরীক্ষণে। জীবেন্দ্রবাবু এই কর্তব্যকে গতানুগতিক যান্ত্রিক ধারায় শেষ করেন নি। তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠ মনন, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও স্বকীয় লিখনশৈলী প্রীতিপ্রদ। তাঁর গ্রন্থের প্রধান গুণ এই যে,

তিনি-আলোচিত লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং আমাদেরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন।

এই ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে কিন্তু তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটি মোটেই আবশ্যিক নয়। সে পরিচ্ছেদের নাম 'অনাধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ঐতিহ্য।' এই পরিচ্ছেদটিকে 'অনাবশ্যক মনে না করলে' গ্রন্থকার খুশি হবেন—এ কথা ভূমিকাতে তিনি বলেছেন: কিন্তু তিনি অনাধুনিকের নামে প্রাগৈতিহাসিক বাঙালী ও তাদের সংস্কৃতির মূল ধরে টানবার চেষ্টায় অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথমত প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশের মানুষের মানসিক গঠন কি রকম ছিল এ সম্পর্কে তুলনামূলক নৃতত্ত্ব এবং সমাজ-বিজ্ঞান কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছয় নি। তবু জীবেন্দ্রবাবু আচার্য সুনীতিকুমারের একটি প্রবন্ধের একটি অনুমান-নির্ভর উক্তিকে প্রামাণ্য মনে করেছেন। বাঙালীজনের একটি উপাদান অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের সম্পর্কে সুনীতিকুমারের অনুমান এই: 'সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্ম-সমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস, উৎসাহ-হীন, দৃঢ়তাবিহীন ও সংহতি শক্তিতে হীন ছিল। কিন্তু লাঘব-স্বীকারের মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।' জীবেন্দ্রবাবু মন্তব্য করছেন: 'ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর চরিত্রেও কি এই সব দোষগুণ কম-বেশি পরিমাণে দেখা যায় না?' এই সব দোষগুণ কম-বেশি পরিমাণে নেই এমন কোনো নরগোষ্ঠী কি ভূভারতে আছে, না ছিল, না থাকবে? এ কালের অগ্রগণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড তাঁর Man Makes Himself গ্রন্থে বলেছেন: 'No exact correlation can, however, be established between the cultural and the racial groups' (p. 56)। তারপরে, কেন তিনি race এবং তথাকথিত racial characteristics-এর কথা তাঁর গ্রন্থে তোলেন নি তার যুক্তি হিসেবে বলেছেন: 'The word *race*, the reader will note, has hardly been mentioned in this book... A popular theory attributes an innate "capacity for leadership" to a hypothetical Nordic race. It would have been easy to *explain* in this way the progress of

mathematics in Babylonia as due to a *mathematical talent* inborn in Sumerians or Semites... But such a procedure would not have been scientific explanation...we have...tried to show how certain societies in the process of adjusting themselves to their environments were led to create states and mathematical sciences by applying distinctively human faculties, common to all men. No changes in germ plasm, introduced by unknown non-human agencies, had to be assumed.... It is the social traditions, shaped by the community's history, that determine the general behaviour of the society's members... We have seen that the behaviour is not innate. It is not even immutably fixed by the environment... It is constantly changing as society deals with ever new circumstances. Tradition makes the man, by circumscribing his behaviour within certain bounds; but it is equally true that man makes the tradition' (pp. 237-238)।

উদ্ধৃতিটি কিছু দীর্ঘ হল কিন্তু বিষয়টি জটিল বলে এবং অনেকে সাহিত্য আলোচনায় নৃতাত্ত্বিক প্রক্ষেপ একটি নূতন ধারার সূচক বলে মনে করায়, গর্ডন চাইল্ডের যুক্তি সবিস্তারে সন্নিবেশ করতে হল। নৃতাত্ত্বিক প্রকল্পকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগে জীবেন্দ্রবাবু শেষ পর্যন্ত realism ও humanismকেও racial বৈশিষ্ট্য বলে প্রচার করতে উদ্যত হয়েছেন। তা না হলে তিনি কেমন করে বলতে পারেন 'অস্ট্রিক রক্ত যাদের শিরায় আছে, জীবন-রস-রসিকতা ও বস্তুনিষ্ঠা তাদের স্বভাববিরোধী নয়।' তাহলে ইংরেজের মনের বস্তুনিষ্ঠা আর Red Indianদের বা Alta Miraর Cave-manদের জীবন-রস-রসিকতার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে? তাছাড়া এই নৃতাত্ত্বিক প্রকল্পগুলি আধুনিক অর্থাৎ রামমোহনোত্তর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত? নাগপুজো আর মাতৃকাপুজো বাঙালী কার কাছ থেকে কবে পেয়েছিল তা নিয়ে গবেষণা মনসামঙ্গল বা গঙ্গামঙ্গল বুঝতে সাহায্য করলেও করতে পারে কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভবানীচরণকে বুঝতে কি সাহায্য করবে? তাছাড়া, এ কথাও জীবেন্দ্রবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মোহেঞ্জোদড়োর

লোকেরাও মাতৃকাপুজো করত ; আর সাপ টোটেম ছিল এমন অনেক প্রাচীন, মাইকিনীয়, নরগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এবং মোহেঞ্জোদড়োর জনগোষ্ঠী যে দ্রাবিড় জাতীয় ছিল এ কথা অত্যাধুনিক পণ্ডিতেরা কেউ জোর করে আর বলতে পারছেন না। মোহেঞ্জোদড়োর শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে আবার মোঙ্গোলীয় মূর্তিও পাওয়া গেছে। এদিকে মাতৃকাপুজো প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া এবং সুমেরেও ছিল। প্রাচীন মাতৃকামূর্তি ইউরোপেও পাওয়া গেছে।

অতএব এই জাতীয় প্রাগিতিহাস বর্তমান কালকে বুঝতে সামান্যই সাহায্য করবে। ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই জাতীয় নৃতাত্ত্বিক প্রকল্পের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে Celtic বা Anglo-saxon মানসিকতার কথা বলা হয়; কিন্তু তাও cultural tradition হিসেবে ; innate mental facultyর প্রকাশ হিসেবে নয়।

শেষ আর একটি চিন্তা-বিপর্যয়ের উল্লেখ করতে চাই। গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় জীবেন্দ্রবাবু বলেছেন : 'জাতির জীবন যে পথে যেমন রূপে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্যের সৃজনকার্য চলতে থাকে।' কথাটি এমনি শুনতে বেশ। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের বাস্তবজীবনের সম্পর্কটিকে যেন সূত্রাকারে ধরে দেওয়া হয়েছে। সমাজ-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক আছে এ কথা এমনিই স্বতঃসিদ্ধ যে না বললেও চলে। কিন্তু সমস্যা হল ঐ 'যে পথে যেমন রূপে······ঠিক তেমনিভাবে'-কে নিয়ে। সমাজ-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ঐ রকম কোনো প্রত্যক্ষ, সরেখ, সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণিত হয় নি। উদাহরণ দেওয়া যাক : ইংলণ্ডে যখন উনিশ শতকের প্রারম্ভে রোম্যান্টিক ভাবধারা এল তখন সমাজদেহে কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার প্রকোপ। এডমণ্ড বার্কের ফরাসী বিদ্রোহের প্রতিবাদ থেকে আরম্ভ করে পিটের আমলে Habeas Corpus আইনের অবৈধকরণ এবং তারপরে Castlereagh মন্ত্রিসভার আরও প্রতিক্রিয়াশীলতা। এদের মধ্যে 'যেমন তেমনের' সম্পর্ক কোথায়? Dante যখন Divine Comedyর মতো মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত তখন তাঁর মাতৃভূমি অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরীভূত। আবার বাংলাদেশে চণ্ডীদাস যখন পদাবলী রচনা করলেন (চণ্ডীদাসের সনাক্তকরণের সমস্যাকে অবশ্য আমল না দিয়েই বলছি) তখন চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালির মন উদ্বেল হয় নি। (চণ্ডীদাসের সহজিয়া তত্ত্বকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বে

পরিণত করলে তবেই এ সমস্যা ঘটে)। আর আজ যখন ভারতবর্ষে এবং সেইজন্যে বাংলাদেশে স্বাধীনতা এসেছে তখন সাহিত্যে সেই স্বাধীনতার উদ্দীপনার এবং প্রাণশক্তির প্রকাশ কই? রুশদেশে বিপ্লব সাধিত হয়ে সাম্যবাদ আসতে চলেছে। সমাজ-জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে। কিন্তু উপন্যাসে, কবিতায়, ছবিতে তার তদনুযায়ী প্রকাশ কই? বাস্তবজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই সুষম-বিষম সম্পর্ক নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মনস্তত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত এবং মনোবিকলন তত্ত্বের আরও অনেক অগ্রগতি না ঘটলে মনের সঙ্গে বহির্জীবনের এই জটিল সম্পর্কের কোনো গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ সম্ভব হবে না।

জীবেন্দ্রবাবু গ্রন্থের মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরেজী সাহিত্যের ব্যক্তি বা ধারার সঙ্গে আলোচ্য পর্বের বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি বা ধারার সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন। তুলনামূলক বিচার যে দৃষ্টির প্রসার ঘটায় এবং সত্য-নির্ধারণে বহু সাহায্য করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গ্রন্থে এই প্রকারের বিচারে জীবেন্দ্রবাবু যথেষ্ট সাবধান না হওয়ায়, কখনও বা এরণ্ড-বটের সাযুজ্য ঘটিয়েছেন, আবার কখনও গোত্র-স্খলন ঘটিয়েছেন, আপাত-সাদৃশ্যের প্রভাবে। ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনায়, গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায়, লেখা হয়েছে : '"কলিকাতা কমলালয়ে" সামাজিক উদ্দেশ্যের দ্যোতনা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাতে রচনারীতির সরসতা ও ব্যঙ্গাত্মক লঘু-ভঙ্গীরও প্রকাশ আছে। এখানে কার্লাইলের অভিশাপের কশাঘাত, সুইফ্‌টের মর্মভেদী বাক্যবাণ বা শ'এর দীপ্ত ব্যঙ্গাস্ত্র নেই।' এখানে কার্লাইল, সুইফ্‌ট বা শ'কে আনার কি প্রাসঙ্গিকতা আছে? কথা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ঊষাকাল নিয়ে। সেই কালের কোনো গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করার জন্যে বিদেশের কোনো সমানধর্মার নাম করা যেতে পারে। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের তিনজন দিক্‌পালের নামের উল্লেখে ভবানীচরণের বৈশিষ্ট্য কি আমাদের কাছে বেশি প্রকট হল? তাছাড়া, সুইফ্‌ট যে যুগের লেখক সে যুগ হল ইংরেজী সাহিত্যে গদ্যের স্বর্ণযুগ এবং সুইফ্‌ট সেই গদ্যের সার্থকতম কারুকৃৎ-দের অন্যতম—অন্যতম কেন, অদ্বিতীয় কেননা Paradise Lost-এর মতো Gulliver's Travels ও অনন্য। Gulliver's Travels-এর ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ও প্রকরণে আর ভবানী-চরণের উদ্দেশ্য ও প্রকরণে সাত সাগরের ব্যবধান। কার্লাইলের নামের

উল্লেখের কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই এই সূত্রে। আর শ' ব্যঙ্গনিপুণ ক
কি তাঁর নামটাও করতে হবে ? অবস্থা হাস্যকর হয়ে উঠেছে যখন জীবে
বাবু বিদ্যাসাগরের গদ্যে বিষয়প্রাণতা বা বস্তু ও আঙ্গিকের অঙ্গাঙ্গী
দেখাতে গিয়ে James Joyce-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। Jam
Joyce-এর শিল্পকলা যে উদ্দেশ্য থেকে জন্মেছে তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শি
লক্ষ্যের দূরতম যোগও নেই। Joyce হলেন চেতনা-সর্বস্ব লেখক—stre
of consciousness তত্ত্বের প্রবক্তা ; আর বিদ্যাসাগর হলেন বিষয়-প
লেখক। Joyce একেবারে subjective আর বিদ্যাসাগর একে
objective। তার ওপর এঁদের মধ্যে যুগ ও জীবনদর্শনের একান্ত পার্থ
তাই হঠাৎ বিদ্যাসাগরের সূত্রে Joyceকে দেখে কেমন যেন একটা অ
লাগে। বিদ্যাসাগর যে সব ইংরেজ লেখকের লেখা বাংলায় রূপান্তর করে
তাঁর সাদৃশ্য তাঁদেরই সঙ্গে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগপ্রবর্তক হিসেবে ত
সাদৃশ্য সেই সব এলিজাবেথীয় যুগের humanistদের সঙ্গে যাঁরা নবশি
ধারা ইংল্যাণ্ডে বইয়ে দিয়েছিলেন। জীবেন্দ্রবাবুর এই জাতীয় তুলনা-বিভ্রা
আরও নিদর্শন আছে ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠায় যেখানে তিনি Steele, Addis
Pope-এর সঙ্গে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমারের তু
করেছেন।

পরিশেষে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে কয়েকটি কথা। ইদানীং অনেকেই ঈ
গুপ্তের পুনর্মূল্যায়নের পক্ষপাতী। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল্য যুগ থে
যুগান্তরে বদলায়। সে হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের পুনর্বিচার প্রয়োজন। কি
পুনর্বিচার মানে নিশ্চয়ই অহেতুক প্রশস্তি বা পুরাতন-মাত্রকেই উচ্চ
বসানো নয়। জীবেন্দ্রবাবুর মতে, যুগসন্ধিতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত নাগরিকতা
'ঐতিহ্যের নতুন উপকরণ হিসেবে অঙ্গীকার করেছিলেন।' 'ঐতিহ্যের ন
উপকরণ হিসেবে অঙ্গীকার'-এর অর্থ দুর্বোধ্য। তবে অর্থ যদি এই হয়
তাঁর কবিতায় নাগরিক জীবনের প্রথম স্বীকৃতি তাহলে বিস্মিত না
উপায় নেই। কেননা ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত নাগরিকতার স্থান তা
কোথায় হবে ? আর কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিই বা তাঁর কীর্তির এই অপহ
ভাববেন ?

দ্বিতীয়ত ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে গ্রন্থকার 'সর্বব্যাপী মানবিকতার যু
অভিক্ষেপ' দেখেও আবার 'দেশের কুকুর' এবং 'বিদেশের ঠাকুর', 'বি

ছেলের ট্যাশের চালে চলা'—ইত্যাদির চাপে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে
'গুপ্ত কবির মানসিকতা কখনও বিশ্বপ্রেমে উল্লসিত হয় নি।' সমস্ত বক্তব্যটি
কি স্ববিরোধী নয় ? আসল কথা হল এই যে তাঁর সংস্কার-বিমুখ, কূপমণ্ডুক
মন, জাতীয় প্রেম কি তাও উপলব্ধি করেছে কি না সন্দেহ। স্বদেশের
কুকুরকে বিদেশের ঠাকুরের চেয়েও উচ্চতর আসনে বসানোর পেছনে বিদেশের
সব কিছুর প্রতি অন্ধ, নির্বিচার গোঁড়ামি ভিন্ন আর কিছু নেই। বিধবা-
বিবাহের অনুকূলে যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে যে ঈশ্বর গুপ্তের সই
আছে তিনি এই কবি ঈশ্বর গুপ্ত কিনা আমার সন্দেহ আছে। কেননা তাঁর
ঐ সম্পর্কে বহু কবিতা ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। তবু যদি তিনিই সই করে থাকেন
তাহলে হয় সাহেবদের কাছে নিজের নামটা যাবে এই আশায় করেছিলেন
আর নয়তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই নাম-যমকে মুগ্ধ হয়ে
করেছিলেন। স্বদেশের হলেও যে কুকুর সে কুকুর এবং তাকে কুকুরাতিশায়ী
মূল্য দেওয়াকে, আধুনিক যুগে হলে বলতাম, কিপলিং বা হিটলারের
jinjoism ; আর সে কালের পটভূমিকায় বিচার করলে বলব এ সেই
জাতীয় মনোভাব যা বল্লালী কুলীনপ্রথার জন্ম দিয়েছিল—যা পরিবর্তনকে
রুখতে চেয়েছিল আচারের বেড়াজাল দিয়ে। যে ব্যক্তি সে কালের সববিধ
কল্যাণকর কাজকেই সামন্তযুগীয় হিঁদুয়ানীর নিরিখে বিচার করেছেন তাঁর
সেই হিঁদুয়ানিকে 'কল্যাণকর আদর্শ' আখ্যা দেওয়া বিচার-বিভ্রম ছাড়া
আর কি ?

বিচার-বিভ্রমের আর একটি নিদর্শন সুশীল গুপ্তের ঠিক বিপরীত উক্তি,
তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালার নবজাগরণ' গ্রন্থে। তিনি বলছেন,
বঙ্কিমচন্দ্র যে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে দেশ-বাৎসল্য দেখেছেন, তার প্রতিবাদে :
বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলাদেশ
ও বাঙালীকে ভালোবাসিলেও তিনি ছিলেন ইংরেজদের পরাক্রমে মুগ্ধ, যুদ্ধে
ইংরেজদের জয়ে উল্লসিত ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধে নামে তাহাদের
পরম শত্রু। তাঁহার মধ্যেই প্রথম বাঙালী-প্রীতি ও ইংরেজ-প্রীতি যুগপৎ
প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজ-প্রীতির প্রাবল্যে তিনি নানা সাহেব ও ঝান্সীর
রানীকে লজ্জাকর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। এই দ্বৈত-সত্তার জন্যই তিনি
যথার্থ যুগসন্ধির কবি।'

আমাদের ইয়ং বেঙ্গলেরা সাহেব বনে যাওয়ায় যাঁর এত জলুনি তিনি

ঝান্সীর রানীর পুরুষালিতে না হয় চটতে পারেন কিন্তু নানা-সাহেবের আক্রমণে এই অনুমানেই আমরা পৌছতে বাধ্য হই যে, হয় তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সাফল্যের সঙ্গে মুসলমানদের পুনরাধিপত্যের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, নয়তো ইংরেজের থাকাকে জাতির কল্যাণের দিক থেকে প্রয়োজন মনে করছিলেন, আর নয়তো ভাবছিলেন রাজার সঙ্গে লড়াই করা পাপ। দ্বিতীয় বিকল্পটি শিক্ষিত বাঙালীর এক অংশের মনোভাব ছিল। সাং বিমুখ ঈশ্বর গুপ্তের মন নিশ্চয়ই ওভাবে ভাবিত ছিল না। প্রথম ও তৃতীয় বিকল্পের যে কোনো একটি বা দুটিই সত্যি হলে ঈশ্বর গুপ্ত যুগসন্ধির কবি ননই, তিনি হলেন নূতনের প্রতি পুরাতনের শেষ ধিক্কার।

কিন্তু বিশ্লেষণ বা নূতন করে মূল্য নির্ধারণ সুশীলবাবুর গ্রন্থের গুণ বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর গ্রন্থ একটি সংগ্রহশালা। ধর্মান্দোলন, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি—এই পাঁচটি বিভাগে তিনি উনিশ শতকের ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত পর্বের একটি তথ্য-মূলক পরিচয় দিয়েছেন। এক জায়গায় তথ্যগুলিকে পাওয়ায় গবেষক ও জিজ্ঞাসুদের খুব সুবিধে হবে।

সুশীলবাবু তথ্য ছেড়ে যেখানে যতটুকু বিচারে নেমেছেন, সেখানে ততটুকুই, হয় পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তের অনুসরণ বা পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে ১৯৫৭ সাল থেকে এত নূতন কথা বলা হয়েছে যে ঐ ঘটনা সম্পর্কে তিনি পুরনো মত—যেমন বাঙালীরা বিদ্রোহকে একেবারেই সমর্থন করে নি—হুবহু মেনে না নিয়ে, অন্তত ডাঃ সুরেন সেন, সুকুমার মিত্র, প্রমোদ সেনগুপ্ত ইত্যাদির মতের উল্লেখ করতে পারতেন।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় সুশীলবাবুর মন অহেতুক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং রামমোহন সম্পর্কে আলোচনায় তিনি ডাঃ সুশীলকুমার দের অনুসরণে, আরও অগ্রসর হয়ে, অবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। মনে হয় তিনি বুঝি হিন্দু revivalism প্রচার করছেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের বক্তব্যের 'if'টি-র কোনো মূল্য না দিয়ে এবং কে. এস. ম্যাকডোনাল্ডের 'he is said to have'—অর্থাৎ জনশ্রুতি-প্রণোদিত কথা (যে কথাগুলি রামমোহনের অসংখ্য শত্রুরা তারস্বরে রটিয়েছিল) তাঁর ... বলে মেনে নিয়ে, সুশীলবাবু আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে রামমোহন অর্থের ব্যাপারে নির্বিবেক ছিলেন। তারপর রামমোহনের যবনীগমনের কথা 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর সাক্ষ্যে সুশীলবাবু শুধু মেনেই নেন নি, মন্তব্য করেছেন

'রামমোহন রচনাবলীর কোথাও যবনীগমনকে অস্বীকার করা হয় নাই।' অর্থাৎ রামমোহনের উচিত ছিল তাঁর গ্রন্থাবলীতে, উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা, 'ও গো, তোমরা শুন! আমি কদাপি যবনীগমন করি নাই। আসিয়া দেখিয়া যাও আমার স্ত্রী সুস্থ মস্তিষ্কেই আছেন!'

রামমোহনের শত্রুদের রটনা-করা (অবশ্য রামমোহন যবনীগমন করে থাকলেও তা নিয়ে এত হাঙ্গামা হত না, সব চাপা পড়ে যেত, যদি তিনি জাতে ওঠার জন্যে, মাথা হেঁট করে ব্রাহ্মণদের বা শীলেদের বা দেবেদের কিছু দক্ষিণা দিতেন) এই সব দোষ কীর্তন করার পর, সুশীলবাবুর মত হল, 'রামমোহনের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে উপরি উক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া তাঁহার ধর্মমতের আলোচনা করিলে তাঁহার সত্য রূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে।' অর্থাৎ গুজবে কান দিয়ে, এবং রামমোহনের কীর্তিগুলিকে গৌণ স্থান দিয়ে, তবে তাঁর চরিত্রকে আমাদের বুঝতে হবে।

তথ্য-পরিবেশনই এ গ্রন্থের প্রধান গুণ এবং সে তথ্যও যে মাঝে মাঝেই এই প্রকারে পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে এইটাই দুঃখের।

শীতাংশু মৈত্র

সিপাহী থেকে সুবাদার ॥ সুবাদার সীতারাম। অনুবাদক : শোভন বসু। মিত্র ও ঘোষ। তিন টাকা ॥

সীতারাম ১৮১২ সালের কাছাকাছি সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পিণ্ডারী যুদ্ধ, গোর্খা যুদ্ধ এবং প্রথম আফগান যুদ্ধে ইংরেজের হয়ে লড়াই করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সাতবার গুরুতর জখম হয়েছিলেন এবং বীরত্বের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ছটি পদক। শেষ পর্যন্ত তিনি সিপাহী থেকে সুবাদারের পদ লাভ করেছিলেন। 'সিপাহী থেকে সুবাদার'—সীতারামের আত্মকথা।

সীতারাম ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী। ১৭৯৭ সালে তিলুই গ্রামে তাঁর জন্ম। সীতারামদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। সীতারাম সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন অর্থের প্রয়োজনে নয়, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।

জীবনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিলেন সীতারাম—'সিপাহী

থেকে সুবাদার'-এ তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বইটির ঐতিহাসিক মূল্য অন্য কারণে।

সীতারাম সামান্য লেখা-পড়া শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর বইতে তাই সেকালের সমাজজীবনের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের কাছে বইটি আরও মূল্যবান এই কারণে যে এই বইয়ে সেকালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আছে। আর সে বিবরণ মোটামুটি বিষয়মুখী।

মহাবিদ্রোহ যখন শুরু হয় সীতারাম তখন ছুটিতে ছিলেন। কিন্তু বহু বিপদ সত্ত্বেও ছুটির শেষে তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহী হাতে তিনি বন্দীও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের প্রতি অনুগত ছিলেন। সীতারামের পুত্র 'বিদ্রোহী' দলে যোগ দিয়েছিলেন—তার জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তথাপি সীতারামের প্রভুভক্তি অবিচল ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আত্মকথায় তিনি তখনকার সেনা-বিভাগের দোষ-ত্রুটি, দেশী সিপাহীদের প্রতি ইংরেজদের অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা লিখে রেখে গেছেন।

'সিপাহী থেকে সুবাদার' তথাকথিত সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস নয়। মহাবিদ্রোহের বিবরণ এতে অল্পই আছে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ কেন হয়েছিল তা বুঝতে হলে বইটি অবশ্যই পাঠ করতে হয়।

'সিপাহী থেকে সুবাদার' হিন্দী ভাষায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু মূল পুথি এখন আর পাওয়া যায় না। বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন কর্নেল নরগেট। এই ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য। শ্রীশোভন বসু বইটির একটি বাংলা তরজমা প্রকাশ করে সময়োচিত কাজ করেছেন। তাঁর অনুবাদ বেশ ঝরঝরে হয়েছে।

প্রদ্যোৎ গুহ

উপকণ্ঠ ॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারী। এভারেস্ট বুক হাউস। চার টাকা।

'উপকণ্ঠ' একটি সময়কেন্দ্রিক উপন্যাস। সময়টা সম্ভবত এই দশক। অর্থাৎ যখন, ডালহাউসিমুখী ট্রামের পা-দানির প্রতি কোনো বিবর্ণ বাসি কেরানির

আবেগকে একটি কবিতার বিষয় করা হয়, কিংবা, ভালোবেসে বিবাহিত যুবক-যুবতীরও একটু আন্তরিকতার ইচ্ছায়…অথচ উপযুক্ত স্থানাভাববশত, শেষ পর্যন্ত ভাড়াটে ফিটন গাড়ির চলমান নির্জনতায় দুটো কথা বলার আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে আশ্চর্য গল্প লেখা যায়। এ সেই দশক, যার ভিতরে জীবনধারণের তাগিদ এক অদ্ভুত তপস্যা, যখন, হাসতে গিয়ে হঠাৎ চমকে থেমে যেতে হয় অনিবার্য ধারালো প্রশ্নে।…এবং এই সবের ধারাবাহিক প্রতিধ্বনি শ্রীযুক্ত প্রবোধবন্ধুর 'উপকণ্ঠ।'

কোনো এক নষ্ট ভাঙা গলির ভিতরে গল্পের চরিত্রেরা থাকে। গল্পের শুরুতে ঐ গলি, শেষেও ঐ রকম আরেকটি গলি। মধ্যিখানে শুধু নায়িকাটির বিশ্বাসের মতো আসা-যাওয়া করে আবছা একটি বিশেষ স্বপ্নের hallucination। কমলা, নীহার, পারুল তিন বোন, বাবার চরিত্র কমলাপতির, এবং মা সুষমা। ফ্ল্যাশব্যাকে বলা হল, এদের অবস্থার ভালো দিনগুলো খুবই ভালো ছিল। অতঃপর কমলাপতির চাকরি যাওয়া, উজ্জ্বল দোতলা বাড়ির থেকে একতলার স্বল্পপরিসর দুটি মাত্র টালির ঘরে নেমে আসা, বছরের সবগুলো ঋতুর প্রবল অত্যাচার সহ্য-করা বিবশ কিন্তু বিহ্বল রাখহরি দাস লেনের খুঁটিনাটি, এবং দিন ফেরাবার লড়াইয়ে ভাঙতে-ভাঙতে-ভাঙতে গুঁড়িয়ে যেতে-থাকা কমলাপতির মরিয়া সংসার। এরই মধ্যে মধ্যে আসে কমলাদের দূরসম্পর্কিত দাদা সনৎ, বিড়িতে টান দেয় আর চাকরি খোঁজার গল্প করে; আসে সনতের গেরস্ত-টাইপ বন্ধু নিখিল যে, মেজোবোন নীহারকে ভালোবাসার কথা শোনায়; আসে মেদবহুল সাধারণ গৃহিণী-মার্কা ননীবালা ও তার দেহজীবা কন্যা সন্ধ্যা যার, একা বসে-বসে বৃষ্টি দেখা একটা শখ, এবং যে, একটি ব্যর্থ প্রেমের মধ্যেও নিজেকে গভীর করে তুলতে চায়; আসে সকলে, এমনকি, মাথা-ঠাণ্ডা-রাখা নিরীহ কমলা তারও মানসিক ছায়াপথ থেকে একদিন সত্যি-সত্যিই নেমে আসে সেই প্রেমিক যার নাম এখানে, নিতাই। তারপর কাহিনীর দ্রুত ঘূর্ণিতে আচমকা চোরাটান লাগে, দেখা যায়—একটু বেশি খিদে পায় বলে ছোট কচি মেয়ে পারুর উপর অকথ্য প্রহারের দাগ, কমলাপতির সাংঘাতিক ব্যাধি, সুষমার বস্তিসুলভ সকল প্রকার ধৈর্যচ্যুতি, কমলার নিঃশব্দ ও অবৈধ অর্থসন্ধান, এবং যে মেয়েটা সাজতে-গুজতে ভালোবাসত, বেঁচে থাকতে খুব ভালোবাসত, সেই মেজো

মেয়ে নীহার কুয়োপাড়ের কাঁঠালগাছে তার অত প্রিয় নরম শরীরটাকে সামান্য দড়ির ভরসায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।···এরপর কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে অসুস্থ অস্তিত্বের প্রতি তীক্ষ্ণ ঘৃণাবশত কমলাকে চোরের মতো অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে নিতাইয়ের সঙ্গে বিবাহ করতে হয়। কিন্তু সবটাই যেহেতু এই দশকের টানাপোড়েনের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত, সুতরাং কমলার পূর্বেকার অন্ধকার জীবিকালব্ধ বিশ্রী রোগে সংক্রামিত হয়ে নিতাইকেও মারা যেতে হয় ক্ষয়ে-ক্ষয়ে; এবং পুনশ্চ কমলার সেই hallucination-এর দৃশ্যের রূপকে টের পাওয়া যায় যে, তাকে বাঁধা পুতুলের মতো ফিরে যেতে হল লালদার লোভনীয় পণ্য হিসাবে; কিংবা ঐ জাতীয় কিছু।—এই গেল 'উপকণ্ঠ'-র কাহিনী।

আমাদের চতুর্দিকের ক্রমে ঘন-হয়ে-আসা বিরক্তি এবং অবক্ষয়ের কথা সর্বক্ষণ বলেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধবন্ধু। সেইটুকুর সততা অবশ্যই স্বীকার করি। সমগ্র উপন্যাসটিতে একটি মানুষও শক্ত পায়ে কেন দাঁড়াতে পারছে না, তারও কারণ বুঝি। সেটা হচ্ছে নিরন্তর নিরাশা। কিন্তু তাই বলে, দাঁড়াবার ইচ্ছাটাও অত তিমিরবিলাসী কেন? উদাহরণ, নায়িকা কমলার ঐ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। কমলা শান্তি চায়, অথচ মৃত্যুর বিকৃত স্বপ্ন দেখে। কিংবা ৭৮ পৃষ্ঠায়, উড়ন্ত জোনাকির অপূর্ব মুড আনতে পারলেও, একটু পরে লেখককে বলতেই হল 'উড়ে-উড়ে চক্কর খাওয়ার কথা। নীহারের আত্মহত্যা হয়তো স্বাভাবিক (?), কিন্তু কমলাকেও শরীর বিক্রি করতে হয়, বা নিজের পক্ষে মৃত্যুর স্বপ্নে ডুবতে হয় কেন? এসব কী মর্বিডিটির লক্ষণ? তাছাড়া কাহিনীতে নিতাইয়ের ভূমিকা কেমন ভাসা-ভাসা, হাল্কা মনে হয়, এবং তার আর্থিক দুর্যোগ যুক্তির অভাবে স্কীমেটিক লাগে। সবশেষে কমলার দুঃ পরিণতি জানার পর, বিস্ময়করভাবে মনে পড়ে 'চালক'-এর অজিতকে কেন মানিকবাবু একটা 'তথাকথিত হীন' পেশায় জীবনধারণ করিয়েও অটুট ব্যক্তিত্ব দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু কমলা সংকুচিত হতে হতে ছোট হয়ে গেছে। কেন? লেখকের দায়িত্ব কী শুধু নৈরাশ্যের বর্ণনাতেই শেষ?

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জুনাপুর স্টীল (পূর্ব খণ্ড)॥ গুণময় মান্না। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। দশ টাকা॥

গুণময় মান্নার চতুর্থ উপন্যাস 'জুনাপুর স্টীল'। প্রথম উপন্যাস 'লখীন্দর দিগার' লিখেই তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কৃষক-জীবনের যে অন্তরঙ্গ ছবি তিনি এই উপন্যাসটিতে উপস্থিত করেছিলেন তা তৎকালীন বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ ছিল। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কটা-ভানারি' ও তৃতীয় উপন্যাস 'জননী'। এ দুটিও কৃষক-জীবন নিয়ে লেখা। পাঠক হিসেবে আমরা আশা করছিলাম যে বাংলাদেশের কৃষক-জীবন নিয়েই গুণময় মান্না একটি মহৎ উপন্যাস লিখবেন। ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল তিনি রবীন্দ্র-চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। রবীন্দ্রচর্চার ফল হিসেবে একটি গ্রন্থ তাঁর নামে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই এই 'জুনাপুর স্টীল'। এই উপন্যাসটি হাতে নিয়ে আমাদের অপূর্ণ আশা চমৎকৃত হয়েছে। কৃষক-জীবন নয়, এবারে গুণময় মান্না আমাদের উপহার দিয়েছেন পরিপূর্ণ একটি শিল্প-নগরীর ছবি। যদিও সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, পূর্ব খণ্ড মাত্র, কিন্তু এই একটি খণ্ড পড়েই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করা চলে যে 'জুনাপুর স্টীল' মহৎ উপন্যাসের লক্ষণবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ উপন্যাসটি হয়তো একটি স্মরণীয় সৃষ্টি হিসেবে দীর্ঘকাল পাঠক সমাজে আদৃত হবে। কারণ এ-ধরণের একটি উপন্যাস লিখতে হলে যে বিপুল অভিজ্ঞতা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন—গুণময় মান্না তা আয়ত্ত করেছেন। হালের পাঠক ভুলানো ভৌগোলিক বা নৃতাত্ত্বিক চুটকির ফোড়নে ঝাঁঝালো করে তোলা সাহিত্যের আসরে 'জুনাপুর স্টীল' একটি সুস্থ ও অভিনন্দনীয় ব্যতিক্রম।

৫৬১ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যে চরিত্রটির ওপরে তার নাম শিবলাল, ১নং ব্লাস্ট ফার্নেসের অ্যাসিস্টাণ্ট ফোরম্যান। মনে হতে পারে এই চরিত্রটিই উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু শিবলালকে ঘিরে এবং শিবলালকে ছাড়িয়ে আরো এত অজস্র চরিত্র ভিড় করে আছে এবং প্রত্যেকটি চরিত্র নিজের নিজের কর্মের ও ভাবনার পরিমণ্ডলে এমন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যে মনে হতে পারে এই উপন্যাসের আসল নায়ক সেই অমোঘ শক্তি যা এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রকে ঘুমে ও জাগরণে নিয়ন্ত্রিত করছে। অর্থাৎ জুনাপুর আয়রন ও স্টীল কোম্পানি, সংক্ষেপে জিস্কো। জুনাপুরের মানুষ চায়ের দোকানে বসে যা নিয়ে আলোচনা

করে, তাস খেলতে বসে যা নিয়ে উত্তেজিত হয়, কুস্তির আখড়ায় গিয়ে যা নিয়ে স্বপ্ন গড়ে তোলে—সবই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জিস্কো। এখানে জেনারেল ম্যানেজারের বৌয়ের ধাইগিরি করার বাতিক থেকে শুরু থেকে কোক-ওভেনের সাত নম্বর ব্যাটারির টপম্যান লছমীকান্তের বৌ সরস্বতীর বেমারী পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে রয়েছে জিস্কো। এমনকি, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক, বাপ-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্ক, বাড়িওলার সঙ্গে ভাড়াটের সম্পর্ক, মহাজনের সঙ্গে খাতকের সম্পর্ক, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পর্ক, ওস্তাদের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক—এমনি প্রত্যেকটি সম্পর্কের মাঝখানে নিয়তির মতো ছায়াপাত করে জিস্কো। কখনো কখনো মনে হয় এই জিস্কোই জুনাপুরের বিধাতা। জিস্কোর অনুমতি নিয়েই যেন জুনাপুরের আকাশে চাঁদ ওঠে বা মেঘের টুকরো ভেসে বেড়ায়। গুণময় মান্না সারা উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এবং ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে জিস্কোর এমন সব আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছেন যা জিস্কোর এই প্রচণ্ড ও সর্বগ্রাসী রূপটিকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে।

আর জিস্কো তো শুধু জুনাপুরের বিধাতা নয়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আমাদের এই দেশেরও। জিস্কোর ব্লাস্ট ফার্নেসেই স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। আবার এই জিস্কোতেই একদিকে যেমন মিলন ঘটেছে বিদেশী ও দেশী পুঁজির, বিদেশী ও দেশী মালিকের, বিদেশী ও দেশী অফিসারের—তেমনি আবার জিস্কোই এ দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্র। শরীরের একবিন্দু রক্ত পরীক্ষা করে যেমন সারা শরীরের হালচাল জানা যায় তেমনি জিস্কোর একবিন্দু গবাক্ষপথে গোটা দেশটির আগ্নেয় ছবি ফুটে ওঠে। গুণময় মান্না একদিকে যেমন জুনাপুরের অসংখ্য মানুষকে জিস্কোর পটভূমিতে স্থাপন করতে পেরেছেন, অন্যদিকে তেমনি জিস্কোর পটভূমি হিসেবে সারা দেশের ছবিটিরও খানিকটা আভাস দিতে পেরেছেন। আশা করা চলে যে উত্তর খণ্ডে এই ছবিটি পরিপূর্ণভাবে রেখায়িত হবে।

জিস্কোর পরেই প্রধান চরিত্র শিবলাল। যদিও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান কিন্তু পূর্বতন দু-পুরুষের মজুরের রক্ত রয়েছে তার শরীরে। শিবলালের বাবা চন্দ্রকান্ত শিবুকে বলে, 'শিবু, মনে রাখিস জুনাপুরের এটা আমাদের তিন পুরুষের কারখানা। বাবা রাস্তায় গেলে আর সব মজুররা ছেদ্দা-ভক্তি করত। জানিস, তোর বাপকে অনেকে হিংসে করে, কিন্তু তার মুখের উপরে কথা

বলতে পারে না। তুই সেই বংশের ছেলে, তুই মজুর···মনে রাখিস সে কথা।' অথচ দেখা যায়, যে শিবলালের বাবা-ঠাকুর্দা সাহেব ম্যানেজারকে ভগবানের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করত সেই শিবলালই সাহেবসুবার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। এজন্যে তাকে কোনো রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে আসতে হয়নি বা কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনতে হয় নি। নিজের অভিজ্ঞতা ও সাধারণ বিচার বুদ্ধি থেকেই সে মজুরদের একজোট করতে চেয়েছে ও মজুরদের আন্দোলনে নিজে সামিল হয়েছে। আর তারপরেও বাবাকে সে বলতে পারে, 'বাবা, আমি কথা দিচ্ছি, আপনার···আপনাদের নামের অমর্যাদা হয় এমন কিছু করব না আমি···আমি করি নাই···' কিন্তু একথা বলার পরেও তিন-পুরুষের মজুর শিবলাল বাবার কথা-দেওয়া পাত্রী লীলাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে এই কারণে যে লীলা যদিও রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী কিন্তু লীলাকে আনতে হবে মালিক পক্ষের দালাল বনমালীর ঘর থেকে। আর এই তিন-পুরুষের মজুর হবার অবশ্যম্ভাবী তাগিদেই শিবলাল শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হতে চায়।

শিবলালের এই পরিণতি যে আশাভঙ্গ ও সংঘর্ষের ক্ষেত্রটি তৈরি করেছে তারই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে উপন্যাসের দুটি উজ্জ্বলতম চরিত্র—শিবলালের বাবা চন্দ্রকান্ত ও শিবলালের বোন পুষ্প। চন্দ্রকান্তর মধ্যে একদিকে রয়েছে বাপের কাছ থেকে পাওয়া সাহেব-আনুগত্য, অন্যদিকে একমাত্র ছেলের প্রতি অন্ধ স্নেহের ও প্রত্যাশার টান। পুষ্প চরিত্রটি খুবই কোমল, খুবই মৃদু, পরিবার-পরিজনের মঙ্গল-চিন্তাই যার একমাত্র চিন্তা। আর নিজস্ব ধরনের এই সব চিন্তা দিয়েই সে নিজের জগৎটাকে গড়ে নিয়েছে। আর তারপরে যখন তার এই চিন্তার জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের ঠোকাঠুকি লাগে তখন চোখের জল ফেলা ছাড়া তার আর কোনো গতি থাকে না।

উপন্যাসটির অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে তিনটি পরিবারের খুঁটিনাটি ঘরোয়া বিবরণ। চন্দ্রকান্তর পরিবার, মালিক পক্ষের দালাল বনমালীর পরিবার আর খালাসী অপি সাউর পরিবার। এই তিনটি পরিবারের মধ্যে নানাদিক থেকে যেমন অনেকগুলো যোগসূত্র আছে তেমনি আছে সংঘর্ষের ক্ষেত্রও। আর জিস্কোর সঙ্গে রয়েছে তিনটি পরিবারেরই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পরস্পরের টানাপোড়েন এবং কাছে-টানার ও দূরে-ঠেলার রেখাগুলো এই খণ্ডে মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছে, পরিপূর্ণ ছবিটির জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করা দরকার।

পারিবারিক চিত্র আছে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীব্যানার্জির, সোস্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারি সমীর সেনের এবং অল্পবিস্তর আরো অনেকের। প্রত্যেকটি চিত্রই নিপুণ ও অন্তরঙ্গ। উপন্যাসের এই খণ্ডিত পরিসরের মধ্যেই যে টুকরো টুকরো ছবিগুলো একটা সামগ্রিকতার আভাস আনতে পেরেছে তা লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আর আছে জুনাপুরের অনেকগুলো অনুষ্ঠানের ও মিটিঙের বর্ণনা। বিক্ষিপ্ত বা আরোপিত নয়, ঘটনার অনিবার্য তাগিদে আশ্চর্য রকমের সংযত ও গভীর। উপন্যাসের শেষ দিকে যে কুস্তি-প্রতিযোগিতার ও সঙ্গীতের আসরের বর্ণনা আছে তা মনকে স্পর্শ করে এই কারণে যে বর্ণিতব্য বিষয় সম্পর্কে অনেকখানি জ্ঞান আহরণ করেই তবে লেখক এই অল্প কয়েকটি লাইন লিখেছেন। এ-ধরনের নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হালে ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে।

উপন্যাসে শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি রাজনৈতিক পার্টি, একজন ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা ও একজন কংগ্রেস নেতার ভূমিকা দেখানো হয়েছে। একমাত্র এই রাজনীতির ক্ষেত্রটিতেই এসে মনে হয়, বিষয়টিকে আরো ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ইসমাইল সাহেব এতখানি পরিসরের মধ্যেও কোনো অবয়ব পান নি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক নেতাকে দেখা গেল শুধু একটা বক্তৃতার মাধ্যমে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি যে একটি রাজনৈতিক পার্টি, স্থানীয় কোনো সমস্যাকে তারা যে কখনো বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে বিচার করে না, সর্বোপরি এই পার্টির যে একটি সর্বভারতীয় নীতি আছে—এই উপলব্ধি অন্তত জুনাপুর স্টীলের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের বিবরণ থেকে সম্যকভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে উপন্যাসের একটিমাত্র খণ্ড পড়ে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করা চলে না। আশা করব পরবর্তী খণ্ডে এ-অভিযোগের কোনো কারণ থাকবে না।

সোস্যালিস্ট পার্টি চিত্রিত হয়েছে পার্টি-সেক্রেটারি সমীর সেন ও পার্টি-কর্মী অভিরামের মাধ্যমে। এ-চিত্রটিও পূর্ণাঙ্গ হয় নি। স্থানীয় অবস্থার চাপে সময়ে সময়ে সোস্যালিস্ট পার্টিও নিশ্চয়ই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই—কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই পার্টির রাজনৈতিক ভূমিকাটি বিস্মৃত হলে এই পার্টির স্থানীয় ক্ষেত্রে সংগ্রামী ভূমিকার যথার্থ তাৎপর্যটি কিছুতেই পরিস্ফুট করে তোলা সম্ভব নয়।

মালিকের হাতের মুঠোর ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা জেম্‌স মাধবনকে সারা উপন্যাসে রক্তমাংসের চেহারায় খুব কমই দেখা গিয়েছে। এবং এই নেতাটির ভূমিকা উপন্যাসে যতটা সরলীকৃত হয়েছে, আসলে কিন্তু তা নয়। আশা করি পরবর্তী খণ্ডে লেখক এ-বিষয়টি সম্পর্কেও অবহিত হবেন।

উপন্যাসের শুরু উনিশ-শো বাহান্ন সালের সতেরোই আগস্ট তারিখে। আর প্রথম পর্ব শেষ হচ্ছে পরের বছর পয়লা ফেব্রুয়ারির সকালবেলায়। মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসের ঘটনা। কিন্তু এই সাড়ে-পাঁচ মাসের মধ্যেই জিস্কোর কারখানায় এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যার ফলে শ্রমিকদের জীবনে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। র‍্যাশনালাইজেশন ও ছাঁটাই, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শিফ্‌ট্ সাইক্‌ল চালু করার ঘোষণা ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে স্লো-ডাউন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এমনি সব ঘটনা অনভিজ্ঞ ও কাঁচা কলমে যা হয়ে উঠতে পারত খবরের কাগজের রিপোর্ট তা এক্ষেত্রে সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। শ্রমিক-জীবনের এমন সামগ্রিক ছবি বাংলা সাহিত্যে খুবই কম। তাছাড়া, যন্ত্র সম্পর্কে এবং নিজের নিজের কাজ সম্পর্কে শ্রমিকের মানসিকতাকে তিনি যথার্থ আবেগের সঙ্গে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। এ-ছবিও বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই।

উপন্যাসটি শেষের দিকে এসে এমন এক গমকে উত্তীর্ণ হয়েছে যা লেখকের পক্ষে এক অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। শ্রমিকরা 'ধীরসে চলো' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অ্যাকশন কমিটির নির্দেশ মতো ১লা ফেব্রুয়ারি সেই আন্দোলন শুরু হবে। প্রথমে শীট মিলের দুটো মিল বিভাগে, তারপরে অন্যান্য বিভাগে। নির্দিষ্ট দিনে 'এ' শিফ্‌ট্-এ শিবলাল এসেছে ব্লাস্ট ফার্নেসের ডিউটিতে আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে 'স্লো-ডাউন' আন্দোলন শুরু হয়েছে কিনা সেই খবরটুকুর জন্যে। আর ওদিকে ঠিক সেদিনই কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ইসমাইল সাহেব তিনটি ছেলেমেয়েকে তার কাছে পাঠিয়েছেন ব্লাস্ট ফার্নেস দেখাবার জন্যে। অধৈর্য মন নিয়ে শিবলাল তাদের বোঝাতে শুরু করে কিভাবে কোক কয়লা আর চুনা পাথর আর খনিজ লোহা ব্লাস্ট ফার্নেসের প্রচণ্ড উত্তাপে নিজেরা বদলে যায় আর অপরকে বদলে দেয়। তারপরে উপন্যাসের শেষের আগের পৃষ্ঠায় এসে দেখা যাচ্ছে ট্যাপিং-এর সময় হয়েছে—

"দেখতে দেখতে ন'টা বেজে গেল। চুল্লীর নিচে ছিদ্রমুখে ঘা লাগাতে

বললে শিবলাল, আর নিজে অক্সিজেন পাইপ নিয়ে তৈরী হয়ে রইল। বুক দুরদুর করতে লাগল ওর—যে ধাতু এখনই বেরিয়ে আসবে, কে জানে তা কেমন হবে। 'এই ট্যাপিং সফল হবে তো?'—কর্মী হিসেবে যত অভিজ্ঞ হোক না কেন, এই সময়টিতে সকলেরই বুক কেঁপে ওঠে। শিবলালের উত্তেজিত মস্তিষ্কে এটা শতগুণ হয়ে উঠল।"

তারপরে যখন ছিদ্রমুখ থেকে ঘা মেরে মাটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আর শিবলাল কাঁপা কাঁপা হাতে পাইপটা ঠেলে ছিদ্রমুখে বসিয়ে অক্সিজেন ছাড়বার হুকুম দিয়েছে, ঠিক এমনি সময়ে স্লো-ডাউন আন্দোলনের খবর নিয়ে শিউপ্রসাদ ফিরে এল।

'ক্যা হুয়া?' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল শিবলাল।

'হুয়া বাবু, বিলকুল চলতা হায় স্লো ডাউন, নয়া ইঞ্জিনকে মাফিক চলতা…'

উত্তরে একটা কথাও বলতে পারল না শিবলাল। চোখ ফিরিয়ে ছিদ্রমুখের দিকে তাকাল। বুকের ভেতরটা যেন খামচে ধরেছিল ওর, হাতের পাইপটা অজান্তেই আরো চেপে ধরল ও।

পাইপের মুখটা পুড়তে আরম্ভ করেছিল। মুহূর্ত পরে ধাতুর একটা দলকা এসে পড়ল বালি ঢাকা নালার ওপর। তারপর একটা সরু প্রবাহ—কিন্তু নালায় পড়ে কেমন নিস্তেজ হয়ে উঠল। তারপরেই প্ল্যাটফর্মের ওপরকার কালো টিনের শেডটা রাশি-পরিমাণ আলোয় ঝলমল করে উঠল। ধাতু লোহার প্রবাহ বেরিয়ে এসেছে।

শিবলাল পাইপটা ছেড়ে দিলে। সমস্ত শরীরটা কেমন অবসন্ন, নিস্তেজ মনে হল তার।

'আশ্চর্য, এটাও হল তাহলে, আশ্চর্য…' মনে মনে উচ্চারণ করলে শিবলাল। কিন্তু বোঝা গেল না, স্লো ডাউনের সফলতার সংবাদ, না কি, এই সফল ধাতু-নিকাশন, কিসের সম্বন্ধে এ কথা অনুভব করল ও।"

পূর্ব খণ্ড এখানেই শেষ হয়েছে। এর পরে আমরা শুধু অধীর আগ্রহ নিয়ে উত্তর খণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।

অমল দাশগুপ্ত

পাঠকগোষ্ঠী

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিচয়ের পৌষসংখ্যায় শ্রীঅশোক রুদ্রের 'পরিচয়' ও সাহিত্যিক দায়িত্বহীনতা শীর্ষক আলোচনাটি পড়লুম। প্রথমেই লেখককে সাধুবাদ দিই: নিষ্ঠাহীন 'পরগাছা চালাকি', সুবিধাবাদী মনোভাবে বাঙলা-দেশে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ যখন দিনের পর দিন অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে, তখন সাহিত্য ও জীবনের মৌল নীতি বিষয়ে সৎ আবেগের এমন বলিষ্ঠ প্রকাশ আমাদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে, লেখকের সঙ্গে মতগত সার্থক্য সত্ত্বেও।

এই পার্থক্য অশোকবাবু এবং পরিচয়-পাঠকদের নিকট এবার সবিনয়েই জ্ঞাপন করি। অশোকবাবু ছোটগল্পের আঙ্গিক পরীক্ষারত তরুণ লেখকদের রচনা মার্কস্‌বাদের ছকে বিচার করেছেন; কিন্তু আমার মনে হয় শিল্পবিচারেই এঁদের সাহিত্যিক লক্ষ্যভ্রষ্টতা দেখানো যায়, এবং তাই উচিত। একজন শিল্পী মার্কস্‌বাদী হতে পারেন, নাও হতে পারেন; জীবন এবং শিল্পকে মেলানোয় তাঁর কতটুকু শিল্পগত দায়িত্ব, সততা প্রকাশিত—সেই নিরিখেই সাহিত্য সৃষ্টির বিচার-বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। জ্যাক্ লিণ্ডসে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বলেন, অনেক সময় মার্কস্‌বাদী লেখকের প্রগতির সোচ্চার ঘোষণা সত্ত্বেও অমার্কসীয় লেখকের রচনায় সমসাময়িক জীবনের রূপায়ণ অধিকতর সার্থক বলে তাঁর মনে হয়েছে।

নতুন রীতির যে ক'টি গল্প পড়েছি, তাদের মূলে এদেশের দুঃস্থ জীবন সম্পর্কে কোনও গভীর জিজ্ঞাসা খুঁজে পাইনি, যা প্রত্যেক সৎ শিল্পীরই লক্ষণ। নিজেদের দেশ-সভ্যতা বিষয়ে প্রখর যন্ত্রণায়ই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত, এটা শিল্প সৃষ্টিরই প্রক্রিয়া। ইওরোপের তথাকথিত চৈতন্যপ্রবাহের সাহিত্যিক মডেল এই লেখকেরা আঁকড়ে ধরেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন, ইওরোপ এবং ভারতবর্ষ তুল্যমূল্য নয়। শিল্পবিপ্লবোত্তর ইওরোপের শতখণ্ডিত অস্তিত্বের জটিল চৈতন্যকে ধরার চেষ্টাই জয়েস প্রমুখ শিল্পীরা

করেছেন, সমগ্রতার আর এক নতুন বিন্যাসে, খেয়ালখুশির অসম্বদ্ধতায়
উনিশ শতকে পজিটিভিস্ট দর্শন-বিজ্ঞানের ঐতিহ্যে যে অমানুষিক উপযোগি
—সন্ধানী ব্যবহারিক জীবনের যুক্তির ফ্রেম যে সর্বগ্রাসী প্রাধান্য
তাতে ভাষা জীর্ণ হয়ে আসে, হৃদয়ের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয় ; প্রতী
বিন্যাসের চর্চায় সেখানকার লেখকেরা তার থেকে মুক্তির পথই খুঁজেছিল
শুধু মাত্র ইংরেজী পড়ার দৌলতেই কি ইওরোপের মান্দারিনদের
আমরা, হরিপদ কেরানীরা এক হয়ে গিয়েছি ? এই নতুন শিল্পীরা
শিল্পসৃষ্টির গরজেই তাঁদের জীবনের আশেপাশে তাকিয়ে দেখেন না ?
দেশের সব থেকে বড় শহরেই আধা-গ্রাম্য আধা-শহুরে রূপ বারবা
চোখে পড়ে, বৈদ্যুতিক ট্রামের পাশেই গরুর গাড়ি চলে, ফুটপাথে
নিরন্ন অসহায় মানুষের ভিড়, যেখানে পুরানো সম্পর্কের প্যাটার্নের বৃহ-
দুর্ভিক্ষ দাঙ্গায়ও তখন কিছু গুরুতর পরিবর্তন হয়নি—সেই দেশ, তার
ইওরোপেরই মতো ? কোনও মতে ভদ্রলোকের চাকরি জোটান
এখানকার মধ্যবিত্ত নাগরিকের সব থেকে বড় সমস্যা, অর্ধশিক্ষা, কুশিক্ষা
তাগাতাবিজে বিশ্বাসের নানা সংস্কারে যে মন এখনও অর্ধ-পরিণত থেকে
গেছে—ইওরোপের প্রখর আত্মসচেতনতার সমস্যা তার মধ্যে কোথা
মেলে ? ইওরোপীয় জীবনের অবক্ষয়ের যে তীব্র যন্ত্রণার চাপে জয়ে
কিংবা কাফকা আসেন, আমাদের এই তালগোল পাকানো সমাজে তা
তুলনা কোথায় ! এদেশের অর্ধ-পরিণত মধ্যবিত্ত মনের মতো গদ্যও তো এখ
পর্যন্ত সাবালকত্ব অর্জন করতে পারেনি ; বন্ধনমুক্তির প্রশ্নটা যে কোনদি
থেকে ওঠে জানি না। আঙ্গিকের চতুর খেলার পরিবর্তে সৎ শিল্পী
জীবননিষ্ঠায় এদেশের জীবনের অসঙ্গতির বেদনাকে সাহিত্যভাত করা
চেষ্টার উদাহরণই আমাদের আশ্বস্ত করে।

আর দেশ বলতে কি এই শহুরে, বিকারবিলাসী, মুষ্টিমেয় মধ্যবি
নারীপুরুষকেই বোঝায়। শহরের বাইরেই তো বিরাট অঞ্চল ছড়িয়ে আছে
দুঃস্থতার মধ্যেই সেখানে আমাদের যে সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তৎসম্প
মূল্যজ্ঞান এখনও পাওয়া যাবে—নানা অনাচার-অত্যাচার বিভিন্ন শক্তি
ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় তার সমস্যা বোঝার দিকে কি এঁদের দৃষ্টি পড়বে না
দেশের সভ্যতার ঐতিহ্য বোঝার আগেই চৈতন্যপ্রবাহের চমকপ্রদ পরী
কাফকার অস্থির, ভারসাম্যহীন মননের রূপায়ণেও খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বা

ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা আবিষ্কার করা এমন কিছু কঠিন নয়, সভ্যতার ব্যাপারে তাঁর প্রশ্ন বারবার লক্ষ্য করা যায়।

টলস্টয়ের গল্পের সাবেকী চালেই যে অমৃতের স্পর্শ মেলে, বিস্ময়কর হলেও জয়েস-এর শিল্পকৃতিত্বে তা মেলে না, ইওরোপের মননশীল সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রই স্বীকার করেন। তার এই চৈতন্যপ্রবাহের চর্চায় বিকাশের পথ যে অবরুদ্ধ, সে বিষয়েও তাঁরা এক মত।

তারুণ্যের জীবননিষ্ঠ আবেগকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর কারুর কারুর রচনা এবং আলোচনায় সব সমস্যাকেই একেবারে হাতের মুঠোয় এনে ফেলা হয়েছে—এই ধরনের যে প্রগলভ মনোভাব প্রকাশ পায়, তা তাঁদের শিল্পচর্চার পক্ষেই ক্ষতিকর। ছোট-গল্পের রসবিচার এবং চর্চায় চেখভের ওপর টমাস মানের প্রবন্ধটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এই নতুন লেখকদের শক্তি সম্পর্কে আশা রাখি বলেই সাধারণ পাঠক হিসেবে অভিমত জানালুম। নমস্কারান্তে।

অসিত উপাধ্যায়

'Nothing remains put.'
'Nature abhors vacuum.'

গত পৌষ সংখ্যা (১৩৬৭) 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠীতে একটি 'দায়িত্ব'পূর্ণ সমালোচনা (চিঠি ?) পড়লাম। সমালোচক শ্রীঅশোক রুদ্র। তবে প্রথমেই যখন শ্রীরুদ্র বিনীতকণ্ঠে জানাচ্ছেন যে, তিনি 'সাহিত্য-সমালোচক' নন, এবং ওখানেও যেহেতু তিনি অন্যান্য 'অনধিকার চর্চা'র মতো সাহিত্য-প্রসঙ্গে কিছু 'প্রতিবাদ' করতে চেয়েছেন মাত্র, তখন অগত্যা ওটি-কে শুধু প্রবন্ধ বলাও চলল না, বলতে হচ্ছে 'প্রতিবন্ধ' থুড়ি, 'প্রতিবাদ' : এবং আরো কিছুসংখ্যক 'পরিচয়'-পাঠকের দ্বারা তিনি সমর্থিত হয়েছেন মনে করে এই প্রতিবাদটি পাঠাবার যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন হয়তো, কিন্তু এটা জেনেই যে, তাঁর লেখাটির প্রতিবাদেও একাধিক ব্যক্তি বিরুদ্ধপক্ষে (পংক্তি ৮-১০) দাঁড়াবেন। তিনি দূরদর্শী সন্দেহ নেই। কিন্তু কী করে জানলেন, প্রতিপক্ষের সকলেই মেটাফিসিক্স-এর ছাত্র (পংক্তি ১৩) ?··· প্রথমেই এমন একটি কাঁচা ভুলের ছেলেমানুষী আমাকেই (তাঁর মতে 'প্রতিপক্ষে'র একজন) লজ্জিত করেছে, অবশ্য পরে 'বিরক্তি, উষ্মা এবং

দুশ্চিন্তার কারণ' হয়েছে ব্যাপারটা। কেননা যে 'গুরুত্ব'পূর্ণ প্রতিবাদের প্রথম প্যারাগ্রাফেই অমন দূরদর্শন, তার শেষ অবধি সঞ্চিত সকল মজার স্বাদ নেবার ইচ্ছায় আগাগোড়া শ্রীরুদ্রের লেখাটি পড়ে ফেলায় 'বিরক্তি, উষ্মা এবং দুশ্চিন্তা'র পর্যায়ে যাওয়া ছাড়া মানসিক উপায়ান্তর খুঁজে পেলাম না। ফলে, এখন আমি প্রতিপক্ষের একজন হবার দায়িত্ব বোধ করছি, এবং যে-দায়িত্ব প্রসঙ্গে অশোকবাবুর এই 'প্রতিবাদ' তা-ই প্রকারান্তরে আমারও পাল্টা-প্রতিবাদের কারণ হয়ে উঠল।

আমার তর্ক উপস্থাপন করার পূর্বে আরো একটি কথা পেশ করি, অশোকবাবু তাঁর প্রত্যুত্তরকালে এটাও প্রথমেই জানাবেন আশা করব। সেটি হচ্ছে, 'কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধর বিয়ে দেবার' ব্যাপারটা। ইদানিং হয়তো অনেকেই (সুতরাং, সবাই নন) প্রবন্ধকে কবিতার সঙ্গে জোড়ে পাঠান নিজেদেরই তৈরি-করা আলো-আঁধারি পোশাকে। কিন্তু অশোকবাবু কী শুধুমাত্র সেইগুলোই পাঠ করেন, এবং উক্ত বিবাহবাসরের আতস-সূর্যার আচ্ছন্ন অবসন্ন দৃষ্টিতে অন্য আর কিছু দেখবার সময় করে উঠতে পারেন না? তবে তাঁকে কী escapist বলব, না একচক্ষু? যাঁরা ঐ আলো-আঁধারির কারবার করেন বলাই বাহুল্য, তাঁদের তিনি সম্যক চেনেন তবু সেটাও কী তাঁকে স্মরণ করাতে হবে?—স্বচ্ছ ভাষা তাঁর পছন্দ, 'কাব্যময় ভাষা, প্রতীকতার ব্যবহার ইত্যাদির' প্রতি তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা, তা না-হয় বোঝা গেল; কিন্তু স্বয়ং তাঁর লেখাটিরই ১৩ পংক্তি যেতে-না-যেতেই আশ্চর্য ঐ ভাষা ব্যবহারের চালাকি 'কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধর বিয়ে' কেন? অবশ্য অশোকবাবু নিজেই ঐ মুহূর্তে একটু লোভার্ত হয়ে পড়েছিলেন মনে করে নিলে মিটে যায় (নাকি, শ-ব্যবহৃত marriageability তাঁকে উৎসাহিত করেছিল?)। অশোকবাবুই উত্তরটা দিলে বাধিত হই। এবং ভবিষ্যতে তর্ক করতে নেমে তিনি যেন প্রতিপক্ষের ব্যক্তিদের সম্পর্কে অমন সব ('মেটাফিসিক্যাল' ইত্যাদি) কল্পিত ধারণা (ভীতি?) পোষণ না করেন, অনুরোধ করি।

এক

কোনো দু-একজনের নিজস্ব মতের উপর নির্ভর করে যেহেতু আন্দোলনের সবটা গড়ে ওঠে না, সুতরাং 'ছোটগল্প—নতুন রীতি' পত্রিকায় প্রকাশিত

একটি বা ততোধিক প্রবন্ধের ইচ্ছানামা এখানে প্রাসঙ্গিক নয় স্বভাবতই। এবং দেখা গেল ঐ সংক্রান্ত অংশে শ্রীরুদ্রের বিনয় এবং আগ্রহ আশ্চর্য পরস্পর-বিরোধী। একবার তিনি বলছেন 'দুজন সরকারীভাবেই উক্ত movement-এর সঙ্গে জড়িত'; আবার ৮।৯ পংক্তি পরেই তাঁর স্পষ্ট স্বীকৃতি 'কোন্ লেখক কোন্ দলে পড়েন এসব তথ্য আমার জানা নেই'। পুনশ্চ উদাহরণ দিই, 'ছোটগল্প—নতুন রীতির' বিষয়ে আদৌ তিনি 'গবেষণায় রত হওয়ার প্রেরণা' পাচ্ছেন না, এবং 'সাধারণ মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকবেন' মনে করছেন, অথচ 'ছোটগল্প—নতুন রীতির' আলোচনাকে একেবারে নিজের 'বক্তব্যে'র 'দ্বিতীয় ভাগের গুরুত্ব দিয়ে 'কিছু মতামত' জানাতে চাইছেন; আর ঐ সঙ্গে পত্রিকাটির কোনো একটি গল্প (অন্য প্রকাশিত গল্পগুলি ধর্তব্যের মধ্যে না এনে) পড়েই তাঁর সম্পূর্ণ মতামত তৈরি করে ফেলেছেন এবং ভীষণ ভীষণ আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন করি—অশোকবাবু, আপনি আপনার 'প্রতিবাদে'র উপরে যাঁর দুটি পংক্তির আপ্তবাক্য উদ্ধৃত করেছেন, তাঁরই Erostratus কিংবা Intimacy আপনার সম্যক পড়া আছে তো? এই দুটি গল্প তাঁর বৃহৎ সাহিত্যকর্মে অন্তর্ভূত হওয়ার কারণে তিনিও আপনার 'ইচ্ছানামা' অনুযায়ী অপাংক্তেয় হয়ে যাচ্ছেন না তো? আবার অনুরোধ করি, আপনার উত্তরে ওটুকুও যেন অন্তর্গত থাকে। নাকি, যেহেতু তিনি ফরাসী এবং সাহেব, সেইহেতু আপনি তার ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক অনুসন্ধান করতে এমনিতেই উৎসুক?

এমন মূল আলোচনায় আসা যাক। এবং অশোকবাবুর 'দ্বিতীয় ভাগ'-ভুক্ত প্রতিবাদ-অংশ আমার আলোচ্য নয় কারণে, 'প্রথম ভাগ'টুকুই মাত্র আমার লক্ষ্য।…প্রথম ভাগে চারজন প্রতিবাদবিদ্ধ লেখকের নাম যথাক্রমে: দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ গুহ, সত্য গুপ্ত ও দেবেশ রায়। এঁদের চারটি গল্প গত শারদীয় (১৩৬৭) পরিচয়-এ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরুদ্রের ক্ষিপ্ত অভিযোগ ঐ চারটি গল্প প্রসঙ্গে। এবং তিনি যদিও বক্তব্যের সুবিন্যাস পচ্ছন্দ করেন, তবু তাঁরই অভিযোগগুলি দমকা অগোছালোভাবে এসেছে, পরম্পরা রক্ষণ না করে। তথাপি অশোকবাবু আদর্শবাদী চরিত্রের ব্যক্তি, হয়তো তিনি খুশি হবেন, তাই আমার উত্তরে ঐ অসংবদ্ধতার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে একটু গেরস্ত ভঙ্গি অবলম্বন করি।

অশোকবাবু বলছেন, দীপেন্দ্রনাথ, সত্য গুপ্ত ও প্রদ্যোৎ গুহ-র লেখা

গুলির আঙ্গিক ব্যবহার 'প্রগতিবাদী যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে নিরতিশয় লজ্জার কথা'—এবং যাতে দুর্বোধনে দুরুহ মনে করে এক আত্ম-প্রসাদ পাওয়ার ভাব আছে। কিন্তু অশোকবাবু স্বয়ং যে-ভাবে লেখা-গুলির গল্পাংশটুকু উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর পাঠকদের করিয়েছেন, তাতে আমি (অন্যপক্ষের একজন) সোল্লাসে ঘোষণা করতে পারি যে, অশোকবাবু ঝুটো দুর্বোধ্যতার ধুয়ো তুললেও, তাঁর সহজ বুদ্ধিতেই সবটা বুঝতে পেরেছেন এবং অন্তত আমার থেকে যোগ্যতর কণ্ঠে পরিষ্কার করতে পেরেছেন ঐ গল্পগুলিকে। উদাহরণ প্রত্যেকটি লেখার (গল্পে ?) অশোক রুদ্র কৃত সরল সারাংশ। তার ঐ স্বকৃত সারাংশ দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি গল্পগুলির যেখান থেকে 'ঝুটো দুর্বোধ্যতা'র অভিযোগ আরম্ভ করেছেন সেইখানেই গল্পের শেষ। অর্থাৎ, অচিন্ত্য (ঘোলা জল নোনা জল) গ্লানিকর জীবনযাপনের মধ্যে থেকে-থেকে শেষপর্যন্ত তার প্রেমিকা সুমিতার চেয়েও সুমিতার হাতে ধরা নোটটাকেই (যে নোট চাকরি-দরখাস্তে ব্যবহৃত হতে পারে) বেশি মূল্যবান মনে করে। এইটুকুই কী যথেষ্ট নয় কোনো কালসচেতন প্রগতিবাদী (শ্রীরুদ্র অনুযায়ী) লেখকের চিন্তায়, একটি গল্প তৈরি করার পক্ষে ? কিংবা, প্রদ্যোৎবাবুর 'লোকটি' যে তার মা বা মেয়েকে লাঞ্ছিত বা বিপর্যস্ত হতে দেখে, ক্রমাগত অসংলগ্ন কিন্তু ধারালো চিন্তা করে-করে নিজের অস্থির যন্ত্রণা প্রকাশ করছে—তারপরও কী কোনো প্রগতিকণ্ঠী প্যারাগ্রাফ যোগ করে বলার দরকার ছিল যে, ভীষণ একটা আন্দোলন বানিয়ে বা চিৎকারে চিৎকারে 'লোকটা' তার প্রতিবাদ জানাল ? 'লোকটা'র যন্ত্রণাটুকুই কী আবহাওয়া আনতে পারে না যে-কোনো গল্পের প্রস্তুতির জন্য ?…অথবা, কোনো বীর রমণী (ফুল ফোটার গল্প) উপকথার উচ্চাসন থেকে নেমে এসে সাধারণ জীবনে চলাফেরা করতে করতে যদি এই 'নতুন জীবনে' অতি সাধারণতার মধ্যে শান্তির বীজ অঙ্কুরিত করার সম্ভাবনা দেখেন, এবং সেই অবিচলিত চরিত্রটিকে যদি কোনো বিস্মিত যুবক নিজের নানা সংঘাতপূর্ণ জীবনাদর্শের সঙ্গে মেলাতে যাবার প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত বৈচিত্র্যের মতো আশ্চর্য সব স্বপ্ন ও ঘটনার ভিতরে ঘুরতে-ঘুরতে অবশেষে স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনমুখী ঐশ্বর্যের দিকে লক্ষ্য খুঁজে পায় ; এবং পরিণামে যদি কোনো উৎসবের উল্লাসের আনন্দযজ্ঞে তাঁর (বীর রমণীর) সারা শরীরে একটি সবুজ লতার ক্রমসঞ্চার

উজ্জ্বলতা দেখতে পায়, তবে তখনও কী গল্পটির শেষে আশাবাদী স্লোগানের একটি বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, গল্পটির বক্তব্য বোঝাতে ?

দুই

প্রদ্যোৎ গুহ, দীপেন্দ্রনাথ ও সত্য গুপ্ত-র গল্পগুলিতে সম্পর্কিত চরিত্রসমূহের তথাকথিত 'কে, কী, কেন'র চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়, যা মূলত সর্বজনীন। সুতরাং বক্তব্য ও চরিত্রের আপাত বিশদ আন্তঃসম্পর্কের অভাব খুব একটা উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ করে কী ?…যন্ত্রণা যখন সকলেরই এক, তখন বিশেষ কোনো মধু-মধুর পৃথক জটিল বর্ণনা আতিশয্য মাত্র। প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে, যন্ত্রণার চেহারাটা টের পাইয়ে দেওয়া। এবং সে যন্ত্রণা পাচ্ছে যারা তাদের গোপন প্রতিক্রিয়া ও মানসিক চাঞ্চল্যের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। আর এই বিশ্লেষণের আঙ্গিক কিংবা ভাষা বোঝা স্বভাবতই সহিষ্ণু মস্তিষ্কের কাজ। 'ছোটগল্পের সঙ্গে ধাঁধার বিয়ে'র কথা যাঁরা কল্পনা করতে পারেন—অন্তত তাঁদের ওটাকে একটু 'দুর্বোধ্য' মনে হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। 'লরেন্স, হাক্সলি, জিদ' যেহেতু পুরোমাত্রায় 'বিলাইতি (বিলিতি অর্থে) লেখক' সুতরাং তাঁরা নিছক দুঃস্বপ্ন দেখান না, এবং হাক্সলির চাতুর্য নিছক ঠাসা বুনটের চালাকি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অশোকবাবুকে তা যথার্থ কিছু শেখাতে পারে, ভাবাতে পারে। অতঃপর তাঁকে ভীষণ ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করতে চাই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুরি চুরি খেলা', 'চতুষ্কোণ', 'গুমিলনাইন' প্রভৃতি পরীক্ষামূলক লেখাগুলিকে কী তিনি খারিজ করেন ? শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর গুণেই কী তিনি 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'নব গায়েন', 'হারাণের নাতজামাই' ইত্যাদি পর্যায়ের গল্পগুলিকে মানিকবাবুর একমাত্র সার্থক গল্প বলে মনে করেন ? (সার্ত্রভক্ত প্রগতিশীল অশোক রুদ্র 'শিল্পগুণের অভাবে মানিকবাবুর বহু প্রগতিশীল রচনাকে বাতিল করে দেন না তো, কারণ তাঁর প্রবন্ধেই আবার তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রতি তীব্র আক্রমণ দেখা গেল) কিংবা ননী ভৌমিকের 'পূর্বক্ষণ' কি তাঁর ঐ আশ্চর্য নতুন বিচারে অপাংক্তেয়, বেটো লেখা 'পাওয়া না পাওয়া'র তুলনায় ? এবং এসব বিচারে জানতে চাইছিলাম শ্রীরুদ্রের বাধানিষেধ-মার্কা হস্তক্ষেপ কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

'Shaw কল্পিত Vortex' ভীতি রুদ্রমশাইকে ভাবাচ্ছে, তার কারণ,

তিনি coinage-টিকে খুব রাশভারী মনে করে ভিতরে জারিয়ে নিয়েছে তা না হলে কথনোই অমন একবগ্‌গা ঘোষণায় জানাতে পারতেন যে, 'বিবর্তনের স্রোতে ভেসে' আজই এথনই এই দেশের 'মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত' হয়েছে 'যথন তার আর শরীরের প্রয়োজন' নে 'তার চিন্তা ও অনুভূতিটুকু মাত্র বাকি' রয়েছে। বরং ঐ সব (এক মেজাজর অন্যান্য আধুনিক গল্পের কথাও বলছি) লেখাগুলিকে প্রণ Cross-word puzzle-এর অনুযায়ী না ভেবে, যদি তিনি বুদ্ধি এবং হৃদয়ে পাশাপাশি বসিয়ে একটু গভীর দৃষ্টি ফেলতেন, বোধ করি লেখাগুলি কোনো-কোনোটিকে দুর্বল বা abstract (?) লাগলেও (আপাত বিচারে) vortex উদ্ভূত মনে হত না। বাংলাদেশে এথনো ঐ অর্থে 'সে যুগ' না এলেও, কোনো-কোনো লেথকের সাহিত্য-ভাবনায় 'চিন্তাস্রোত'-এর যুগ এলে ক্ষতি কী? আর তিনিই বা অতটা অবাক হবার কী পেলেন তাতে?

শ্রীরুদ্র যদি হযবরল র উপমা পছন্দ করেন আর 'কাক্কেশ্বর' যদি তাঁর আদর্শ হয়ে থাকে এবং হাতে যদি তিনি পেন্সিলই রাখতে অভ্য থাকেন তো আশ্চর্য হব, কেননা, তাঁর প্রতিবাদেই অমন সুঠা বিশ্লেষণের পরও তিনি কী এই সহজ দুই-আর-দুইয়ে-চারটা জানেন না যে, capitalist economy-র পরিচালনায় দেশ, মানুষ ও সমাজ এক হিসেবে ক্রমঅবক্ষয়ের শিকার হতে পারে। মানুষ সেখানে রক্তকরবীর '৪৭-এর ক', এবং অন্য কোনো সংজ্ঞার দ্বারা অভিষিক্ত নয়।…কেন তিনি আমাদের এই সমাজ ও দেশকে থামথা বেশ 'গণতান্ত্রিক' মনে করে নিতে গেলেন, তা কি জানতে পারি? প্রসঙ্গত সুতরাং, তাঁর জানা উচিত, ঐ তিনটি লেখা ছাড়াও (দেবেশবাবুর লেখাটি তো তাঁর মতে 'হতভাগ্যের গানের সুর', অতএব ওটিকে আর অশোকবাবুর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি, আমাদের সৌভাগ্য) অন্য যে-সব একই ভঙ্গির লেখা প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির একমাত্র তীক্ষ্ণ কারণ—আধুনিক মানুষের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জটিল 'শূন্যমূল্য'তা (যা অশোকবাবুই অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বলেছেন, এবং কার্যকারণ সম্পর্কসহ যে অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্রায়ন আমরা প্রগতিশীল সাহিত্যে, এমনকি আরেক সাহেবলেথক ম্যাক্সিম গকির লেথায় পেয়েছি) এবং নিরুপায় একাকিত্ব যা সমুদ্রের মোহনার কথা জানলেও পিছনের অন্যমনস্ক অন্ধকার-উলুখাগড়ার অরণ্যকে ভুলতে পারে না (ভাষাটা বোধ হয় 'কাব্যময়'

হয়ে গেল; কিন্তু অশোকবাবুই তো নিজের অনুশাসন ভেঙে বিলিতি উপমা চালিয়ে দিয়েছেন Bath-water ও baby প্রসঙ্গে)।

তদুপরি, প্রদ্যোৎবাবুর এবং সত্যবাবুর রচনায় 'আর সব কিছু ভুলে যাওয়াটাকে তিনি কোথায় আবিষ্কার করলেন? এবং এঁদের গল্পের চরিত্র 'চলমান সমাজ-জীবনের' দুরন্ত কুটিল প্রবাহের 'সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়' নেই— এমন সব দারুণ মন্তব্য তিনি কোন্ মানসিকতার সমর্থনে করলেন? সৃষ্টিধর্মী (creative) লেথার শুধুমাত্র পাঠোদ্ধারেই কি তাঁর দায়িত্বের শেষ?

গল্পের চরিত্ররা আলোচ্য লেথাগুলিতে অন্তত আবহাওয়া নিরপেক্ষ নয়—এটা তাঁরই বক্তব্য হতে পারত অন্য অর্থে, 'condition দ্বারা সম্পূর্ণভাবে conditioned' অর্থে নয়। অশোকবাবু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি কথনো কোনো way-side প্ল্যাট্‌ফর্মে বসে, দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করতে করতে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় লেট-হয়ে-যাওয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেছেন কী? যদি করে থাকেন তো, আপনার ঐ সময়কার অসহিষ্ণু ধৈর্যের স্মৃতিটাও নিশ্চয়ই যা-হোক তা-হোক মনে পড়ছে? সেটা কোন্ ধরনের? অবশ্যই খুব একটা নিটোল সম্পূর্ণ কিছু নয়। ছাড়া-ছাড়া আরো সব লোকদের চাপ-চাপ অথচ অস্থির জটলা, টানা বা কাটা-কাটা কথার টুকরো, ইষ্টিশনের বাতিদান, ছোপ-লাগা বাতির আলো, শান্টিং-এর আওয়াজ, লাইনের নিথর মসৃণ উজ্জ্বলতা আর আপনার উশ্-খুশ্ শূন্য-শূন্য একটা অবস্থায় মধ্যে-মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত গাড়িটার শব্দের প্রতীক্ষা—এই সব ব্যতিরেকে খুব ধারাবাহিক কিছু একটা মনে পড়া অস্বাভাবিক। এবং আমি যদি বলি, আমরা সবাই, এই দশকের ভারতবর্ষের। মানুষগুলো অমনই কোনো এক লেট-হয়ে-যাওয়া ইঞ্জিনের প্রতীক্ষায় আপাতত এথানে প্ল্যাট্‌ফর্মে বসে বা দাঁড়িয়ে অস্থির সময় কাটাচ্ছি চাপ-চাপ জটলায়, বিভিন্ন শব্দে-দৃশ্যে-অন্ধকারে-আলোয়, তবে কী আপনাকে বোঝাতে পারব অশোকবাবু, যে, ওটাকেও সাহিত্যের 'সহিত' অর্থে সঠিক এবং সার্থক বলা উচিত?

মার্কস্ তাঁর থিয়োরীর কোনখানে এই সব চেতনাপ্রবাহের রূপায়ণকে নিষিদ্ধ বা অসামাজিক বলেছেন, জানি না।…যে ট্রেনে উঠে আমরা সবাই যাব তার লেট-হয়ে-আসাটা স্নায়ুকে তুলকালাম করে তুলবেই, এবং সেই

অধৈর্যের উশখুশ চেহারা কি বাংলা সাহিত্যেই শুধু অপাংক্তেয়? Aldous সাহেব যদি Brave New World বা Point Counter Point-এ শ্রীরুদ্রকে সৎ অর্থে (?) কিছু ভাবাতে পারেন, শেখাতে পারেন, তবে Mann-এর Tonio Kroger, Saroyan-এর Mother, One Two Three Four···, Ah-ha, (এগুলি বিদেশী বলে হয়তো তিনি বিরুদ্ধমনা নন) কিংবা খাঁটি বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'এক রাত্রি' থেকে আরম্ভ করে মানিকবাবুর পরীক্ষামূলক লেখাগুলি, ননী ভৌমিকের 'পূর্বক্ষণ' ইত্যাদি ইত্যাদি পর্যন্ত কোনখানে 'আশাহীন, উদ্যমহীন, নীতিহীন'? অশোকবাবু কর্তৃক ধিকৃত উক্ত তিনজনের রচনাপদ্ধতি, কথাংশ এবং বিষয়-নির্বাচনের পেছনে ঐ বিশেষ শ্রেণীর কয়েকটি নামের পটভূমি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণে উল্লেখ করলাম। 'ভ্যানগগ-এর ছবি আজ বালিগঞ্জের বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ালে টাঙানো' (আশাপ্রদ সংবাদ বটে!) থাকাতেই তিনি কোন্ যাদুতে বুঝতে পারলেন যে, এই সব 'দিবাস্বপ্ন' (?) দেখা নায়কদের স্রষ্টারা একদিন 'তুচ্ছ হয়ে উবে যেতে বাধ্য? এটা কী শ্রীঅশোক রুদ্র-কৃত মার্কসিজম্-এর নতুন ব্যাখ্যা: মার্কসিজম্—নতুন রীতি অনুযায়ী? প্রসঙ্গত একটা প্রশ্ন করি, 'পরিচয়'-এ এ ধরনের লেখা এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে না। অশোকবাবুর নিদ্রাভঙ্গ এতদিনে হল কেন? এবং উক্ত শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তথাকথিত প্রচলিত রীতির বাকি গল্পগুলি সম্পর্কেই বা তাঁর সিদ্ধান্ত কী? এক-ই লেখকের লেখা 'তাপের শীর্ষে' এবং 'বঙ্কিনাথের সংসার' তাঁর মনে কী ধারণা সৃষ্টি করে? বা 'মিসেস গ্রীণে'র মতো গল্প?

তিন

অশোকবাবু এক জায়গায় বলছেন, আমাদের দেশে 'ওস্তাদেরা সিনেমায় নানান রকম গান গাইছেন, পয়সার জন্য সার্থক নর্তকেরা বীভৎস synthetic নাচ নাচছেন' কিন্তু ইউরোপ-টিউরোপে 'নাইটক্লাবের জিনিস গীর্জায় মেলে না··· শ্রেষ্ঠ সংগীতকারকে দিয়ে খেলো গান গাওয়ানো যায় না···ব্যালে-ডান্সারকে সস্তা নাচ নাচানো যায় না' প্রভৃতি। উত্তরে কয়েকটি খবরই যথেষ্ট:

১। মারিও লান্সা, বেলা ফন্টে, জনি ম্যাথু, ক্রস্‌বি এমনকি পল রোবসন্-কেও বহু চলচ্চিত্রে ফরমায়েসী গান গাইতে দেখা গেছে।

২। হার্নার্ড হারমান্, আলফ্রেড্ নিউম্যান, উইলিয়ামসন্, আর্থার ব্লিস, কর্নস্টেইন, আর্নেস্ট আরভিং, ম্যাক্স স্টেইনার প্রভৃতি বিখ্যাত সংগীতকারদের রূপালি পর্দার জন্য দরকারমতো সঙ্গীতাংশ প্রস্তুত করতে হয়েছে।

৩। স্যর লরেন্স, স্যর সেডেরিক, স্যর রাল্‌ফ, হেল্পমান, ডোনাট্, মুনি এমনকি ডি-সিকা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পয়সার তাগিদে অনেক 'উদ্দেশ্যহীন, নীতিহীন' ছবিতে অভিনয় করতে হয়েছে।

৪। ম্যয়রা সিয়ারার, অ্যাস্টেয়ার এবং আরো অনেক ব্যালে ও ধ্রুপদ-নৃত্যশিল্পীকে অনুরূপভাবে নাচতে হয়েছে সস্তা প্রয়োজনে।

৫। জাভাত্তিনী এবং ডি-সিকা'কে ছবি তোলবার জন্য হন্যে হয়ে এখনো ঘুরতে হয় 'Umberto D' ও 'Bycycle Thief' দেখানোর পরেও।

৬। অপেরার মধ্যে প্রবেশ করা চটুল গানের দারুণ চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে (উদাহরণ আর দিলাম না)।

৭। কোরশাকভ্, শুমান, ব্রাহম, লিস্ট-এর সিম্ফনীর চেয়ে আধুনিক ইউরোপে বেশি জনপ্রিয়—ল্যাটিন আমেরিকান ফিয়েস্টা কিংবা প্রিস্‌লে, হেইলি-র রম্যগান।

৮। Carmen Jones এবং Tales of Hoffmann অভিনয়-সংগীত-শিল্প-নির্দেশনায় শ্রেষ্ঠশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহৃত হন অন্য অশ্লীল উদ্দেশ্যে।··· ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ঐ সবের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যে লিবারেলিজম্ ও কাথলিক ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে, তা যদি একটু বুঝিয়ে দেন অশোকবাবু!··· তদুপরি, খ্রীষ্টানদের গীর্জায় যাবার পোশাক, ব্যবহার (ঔপনিবেশিকদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম) এবং অন্যান্য X-mas ও Pope-কেন্দ্রিক রলরোল কী আমাদের দেশেরই জলবাবা, নেপালবাবা বা তারকেশ্বর-এর মেলাকেই স্মরণ করায় না? তফাৎটুকু নিশ্চয়ই অশোকবাবুর 'মার্কসিজম্—নতুন রীতি' ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। আমি উৎসুক রইলাম।

অনেক কিছু প্রসঙ্গত মনে পড়া সত্ত্বেও অযথা আর এই 'পাল্টা-প্রতিবাদে'র দৈর্ঘ্য বাড়াব না।

চার

কর্তব্য হিসেবে একটি কারণে আমি অশোকবাবুকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য। কেননা, দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে এগুলির যে বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল,

অংশত নিষ্ঠাসহ অশোকবাবু তা করবার চেষ্টা করেছেন ; এবং আমি 'সাহিত্যিকের দায়িত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণের' যে-কোনো গবেষণামূলক (কিংবা সমালোচনা-প্রধান) চেষ্টাকেই স্বাস্থ্যকর বলে মানি, সেই কারণে অশোকবাবুর এই সময়োচিত দিগ্‌সন্ধান ও তত্ত্বালোচনাকে জরুরি মনে করি। কিন্তু এই তর্ক অবতারণার যে শুভ ফলশ্রুতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, তার প্রায় সমস্ত শরিকানা একা অশোকবাবুরই প্রাপ্য হতে পারত, যদি অশোকবাবু তাঁর 'প্রতিবাদে' আরো একটু স্নেহশীল বা sympathetic হতেন। কারণ আমি জানি, ঐ গল্পগুলি অন্য এক ধারায় আলোচনা করা যেত। আমার সংকেতে, দু-একটি নজির দাঁড় করাই।

এক নম্বর। শ্রীসত্য গুপ্ত-র গল্পটির গঠন অসংযত (বিষয়গত অনিবার্যতা থাকা সত্ত্বেও) এবং অতিকথনদোষে দুষ্ট। বাকবিন্যাস কবিতার, কিন্তু কাব্যের প্রসাদগুণ-বঞ্চিত, কারণ কানে লাগে। এমন আঙ্গিকব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হলেও, এই গল্পটিতে তা দক্ষ নয়। প্রথমেই, 'চোখ-বোজা অন্ধকার' থেকে 'মা অন্ধকার হয়ে গেছে' তার প্রমাণ। কেননা, মানসিক চিত্রকল্পনা অসংলগ্ন হতে পারে কিন্তু গদ্যাংশে (কবিতায় নয়) তার বর্ণনাকে যুক্তিপূর্ণ (পরিচ্ছন্ন) সূত্র ধরে আসা-যাওয়া করতে হবে। তারপর গল্পটির পর্ববিভাগে পাঠকের গ্রহণক্ষমতার সুযোগ নেই ; এবং শেষের দিকের সরল সংলাপ যেহেতু আচমকা আবির্ভূত, সুতরাং পাঠক সেখানেও বিব্রত। গল্পটিতে semi-communication-এর লক্ষণ বর্তমান।

দু-নম্বর॥ শ্রীপ্রদ্যোৎ গুহ-র 'কথা কও' মূলত narrtive soliloque শ্রেণীর গল্প। Saroyan-এর Ah-ha প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। সবটাই উত্তমপুরুষ কথিত, সুতরাং 'তুই বলেছিলি, চাকরি পেয়েছিস'-এর সঙ্গে 'পর্বতের আড়াল খুঁজি। পর্বত সরে দাঁড়ায়। অন্ধকারে লুকোতে যাই। অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে।'—স্থূল সংমিশ্রনজনিত অতৃপ্তির উদ্রেক করে, অন্তত এই গল্পে। তদুপরি, 'অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে'-র ভাবার্থ উদ্দীপক, ব্যক্তিগত কাল্পনিক নিরাশা সেখানে বিপরীত সংকীর্ণ অর্থ বহনে অসার্থক। সর্বোপরি গল্পটির শেষাংশ 'অহল্যা মা আমার, জেগে ওঠ' ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয়।

তিন নম্বর॥ শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুল ফোটার গল্প' বায়োগ্রাফি-মূলক নির্মোহ গম্ভীর রচনা হতে পারত—Prof. Mamlock বা

Juarez-এর রূপায়ণের মতো। তা হয় নি 'আমি'-চরিত্রের জন্য। গল্পটির 'আমি' নিজেরই অনেক ভাবানুষঙ্গ উপস্থিত করায়, লক্ষণীয় মূল কথাটি বারবার খেই হারিয়েছে। স্বপ্নগুলি বিভ্রান্ত হলেও অসম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও, যেহেতু তাদের কার্যকারণ সূত্রটি পরম্পরা রক্ষা করে নি, সুতরাং রঙের গাঢ়তা কখনো চড়া, কখনো ম্লান ; এবং মস্তিষ্কে গল্পপাঠকালের অহেতুক অন্যমনস্কতার জন্য দায়ী। এটিকে Sketch Story বলা যায়, কিন্তু impressionist দৃষ্টিপাত এতে প্রবল (Gorky, Maupassant ও Chekhov-এর Chelkas, Autumn Evening, Normandy Joke, The Kiss, Death of a Clerk ইত্যাদি সাধারণ অর্থে Sketch Story-এর উদাহরণ হলেও, সংজ্ঞাগত মিল এই গল্পটিতেও বর্তমান)। তারপর, 'যিনি প্রায় ইতিহাস, যাঁর নাম একটা মন্ত্র' এবং 'চোখের সামনে একটি হলুদ ফুলকে পাতা নাড়তে দেখলাম' ইত্যাদির অঙ্গুলিনির্দেশ শ্রুতিকটু এবং অবাঞ্ছনীয় ছিল। গল্পটিতে ভাবালুতার প্রয়োগ অসার্থক।…

সংক্ষেপে জানালাম। এবং জানালাম এই কারণে যে, লেখাগুলিকে আমার experimental মনে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই দশকের লেখকদের সাময়িক ছোট ছোট দোষ-ত্রুটিগুলি অচিরাৎ শুধরে যাবার দিকে। আর সেইজন্য সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মের অনেক প্রচেষ্টাতেই আমার নানা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, সেগুলিকে বন্ধুজনোচিত দৃষ্টিপাতে বুঝবার চেষ্টা করি। কোনো নির্দিষ্ট ছকে বিচার করি না। ইচ্ছামতো সত্য তৈরির প্রবণতা অশোকবাবু তাঁর 'প্রতিবাদে' আগাগোড়া দেখিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অনায়াসে 'নতুন রীতি' গ্রন্থমালার 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটিতে আবদ্ধ থাকতে পেরেছেন, আবার যদিচ 'সুধাময়' ও 'গোপাল' একজাতীয় চরিত্র নয়, তবুও 'কলকাতা ও গোপাল' প্রসঙ্গে এবং উক্ত লেখকদ্বয়ের উন্মার্গগামিতার প্রমাণ হিসেবে 'চর্যাপদের হরিণী'র আলোচনা ব্যতিরেকে 'সুধাময়' ও 'গোপাল'-কে পূর্বাপর একসঙ্গে ঠাট্টা করে গেছেন। 'নতুন রীতি' থেকে প্রকাশিত 'জটায়ু' ও 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'পশ্চাৎভূমি'র নাম তিনি কোথাও করেন নি (এই প্রসঙ্গে মতি নন্দীও আলোচ্য হতে পারতেন)। লেখক ও লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে অশোকবাবু ঠিক ততখানিই স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, যতখানি তাঁর পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রমাণে সহায়ক হয়। ঠিক এই কারণে আগে এবং শেষে ফুটকি ব্যবহার করে কিছু-কিছু বাক্যাংশ

তুলে প্রমাণ করেছেন তাবৎ তরুণ প্রবন্ধ-লেখক অপদার্থ। এই প্রবন্ধ-লেখকেরা কে, তাঁদের মতামতের গুরুত্ব কতখানি, কী প্রসঙ্গে তাঁরা কতখানি বলেছেন—আমরা তার কিছুই জানলাম না। শত্রুপক্ষীয় বৌদ্ধ মার্কস্‌বাদী সাহিত্য-সমালোচনার নিদর্শন হিসেবে অশোকবাবুরই কোনো কোনো লেখাকে যদি আগে-পিছে ফুট্‌কি দিয়ে এইভাবে উদ্ধৃত করেন, যদি কে এই প্রবন্ধ লেখক, তাঁর মতামতের গুরুত্ব কতটা, কী প্রসঙ্গে তিনি কী বলতে চেয়েছেন, তা অনুধাবন করার চেষ্টা না করেন—তা হলে বাংলাদেশের মার্কসবাদী সমালোচকদের প্রতিও কী এই অবিচার করা হবে না, যা অশোকবাবু এই তরুণ লেখকদের প্রতি করেছেন? ইচ্ছামতো সত্য তৈরি নয়, সত্যের সঠিক রূপায়ণ ও বিশ্লেষণই মার্কসবাদের প্রাথমিক কর্তব্য। একথা অত্যধিক সার্ত্র-হাক্সলিপ্রীতির দরুণই কী তিনি ভুলতে পেরেছেন? সকল বস্তুই যখন সময়ের স্রোতের উপর অগ্রচারী এবং সকল শূন্যতাই যখন প্রকৃতির আরোগ্যনিকেতনে সুস্থ পরিপূর্ণতার (metaphysical অর্থে নয়) দিকে, তখন সাময়িক অপূর্ণতা-বিচ্যুতি-অস্বস্তির নিরাময় তো আমাদেরই উপর নির্ভর করে। জট-পাকানো জটিলতার মর্মোদ্ধারে সরল অন্তর্দৃষ্টিমূলক সমালোচনাটুকুই যথেষ্ট। বাকিটা নিশ্চয়ই মাত্র আমার আর অশোকবাবুর হাতে নেই। সুতরাং 'দুঃস্বপ্নে'র কথা ওঠে না।

পরিশেষে, অশোকবাবুর জন্য আমার আন্তরিক সহযোগিতা নিবেদন করি। এবং আমার বক্তব্যে কোথাও কোনো উগ্রতা প্রকাশ পেয়ে থাকলে, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সংস্কৃতি-সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাঙলা দেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডেকেছিল; তা শুধু উচ্ছ্বাসে শেষ হয় নি, রেখে গিয়েছিল শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতির ছোট বড় সংকল্প; আর দিয়ে গিয়েছিল মানুষ। অতুলচন্দ্র গুপ্তের বিদায়ে এই কথাই মনে হবে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বাঙালী জাতি যে দু-এক জন সমাজপতির দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সাহস সঞ্চয় করতে পারত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। দুর্দিন বাঙলা দেশে ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই দুর্দিনে তাঁর দানে আমরা লাভ করেছি জ্ঞানীর পরামর্শ, শান্ত সমালোচনা এবং প্রয়োজনানুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নির্ভীক পরিচালনা। যে সময়ে দেশনায়ক আর নেই, আছে শাসন-যন্ত্রের যন্ত্রী ও শাসক-দলের চক্রী, সে সময়ে তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম বাঙলার 'সমাজপতি' রূপে। পরিচয়ের পাঠকরা জানেন যাঁদের পরিচালনায় বাঙালী-সমাজ 'বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তির' মত হঠকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করাতে সমর্থ হয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁদের অগ্রগণ্য!

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি দর্শনের কৃতী ছাত্র, সে সময়ে আসে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। কৃতী ছাত্ররাও সেদিন জানতেন দেশ বলে একটা সত্য আছে; বিত্ত ও বৃত্তির জোরে তাকে আয়ত্ত করার অপেক্ষা প্রীতি ও সেবার বলে তাকে সৃষ্টি করা কম কৃতিত্ব নয়। অতুলচন্দ্রও তাই চলে গিয়েছিলেন তাঁর বাসস্থল রঙ্গপুর শহরে সেখানকার জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার নিয়ে। রঙ্গপুর ন্যাশনাল স্কুল স্বদেশী যুগেরও গৌরব। যখন শাসকের দণ্ড চালনায় তার দ্বার রুদ্ধ, অতুলচন্দ্র যোগদান করেছেন রঙ্গপুরের ওকালতি বৃত্তিতে, তখনো তাই কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্রতার আঘাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান নি। এমনকি, বহু পরে যখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের শীর্ষদেশে তখনো এই কারণেই তাঁকে ব্রিটিশ শাসকগণ হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে নিয়োগে

আপত্তি করে—সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গে তবু মচকায় না, এ কথাটা ১৯৪৭-এর পর আমরা ভুলতে বসেছি। অতুলচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু সংবাদে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে সমগ্র বিচারক মণ্ডলী সেদিনের কর্তৃপক্ষের অপকীর্তিকে ক্ষালন করেছেন, সমবেতভাবে জানিয়েছেন তাঁকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবী হিসাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা।

রঙ্গপুর থেকে কলকাতা হাইকোর্টে অতুলচন্দ্র গুপ্ত এসেছিলেন ১৯১৪য় আর সেখানে তিনি ব্যবসায়ের শীর্ষে গিয়ে পৌছান সুনিশ্চিত পদে। কিন্তু সে তাঁর কতটুকু পরিচয়? সুবিচারে নিঃসন্দেহ তাঁর আগ্রহ ছিল। ব্রিটিশ যুগে তিনি দৃঢ়চিত্ত কংগ্রেস-পথিকরূপেই করেছেন ব্রিটিশী অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; আর কংগ্রেস-আমলে ঠিক তেমনি দৃঢ়চিত্তে তিনি করেছেন কংগ্রেসী স্বৈরাচারের প্রতিরোধ। শুধু আইনের পারদর্শিতার জন্য তা করেন নি, এমনকি শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসেও নয়—ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল তার উৎস। তাই সামাজিক অন্যায়েও ছিল তাঁর আপত্তি। তৃতীয় দশকে নাহলে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের কৃতী পুরুষ হয়ে—আত্মীয় সমাজের কৌতুক মাথায় নিয়ে—অতুলচন্দ্র গুপ্ত কেন যাবেন বাঙলার রায়তের পক্ষ হয়ে কৃষক আন্দোলনে? কেন স্বীকার করে নিলেন কমিউনিস্টদের সহযোগে কৃষক-মজুর সভার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব? ন্যায়বুদ্ধির সঙ্গে, মানুষের অধিকারের প্রতি আস্থার সঙ্গে অতুলচন্দ্রের ছিল যুক্তিতে বিশ্বাস, সামাজিক প্রগতিতে শ্রদ্ধা, জ্ঞানীর কল্যাণ দৃষ্টি।

কিন্তু তাও শেষ নয়। তাঁর ছিল সরস হৃদয় আর সেই সঙ্গে দার্শনিকের সংযতচিত্ত—১৯১৪ থেকে 'সবুজ পত্র' বাঙলা দেশে যে ভাব-ধারা সঞ্চারিত করে তার তুলনা একমাত্র 'বঙ্গদর্শন'। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সেইখানে ছিলেন শুধু মার্জিত রুচি ও শাণিত বুদ্ধির জন্যই প্রমথ চৌধুরীর নিকট সহযোগী নয়, কাব্য-জিজ্ঞাসু ও সংস্কৃতি-বিচারক হিসাবেও অগ্রগণ্য। বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালী সংস্কৃতিতে তাঁদের দুজনারই প্রবল প্রীতি ছিল। সাহিত্যে যে তুলনায় তাঁর দান স্বল্প, কিন্তু তা অমূল্য, বুদ্ধির দীপ্তিতে, রুচি ও রসের স্নিগ্ধচ্ছটায় অসামান্য তাঁর লেখা। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি ছিল সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর মমতা। তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছেন ক্ষুদ্র-বৃহৎ, দুঃস্থ-স্বচ্ছল তাঁরা সকলে, প্রায় সকল সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান। সেখানেও আত্মপ্রচার ছিল তাঁর রুচি ও নীতির বিরোধী।

জীবনের শেষ দিকে কঠিন শোকাঘাত তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু শোকে তাঁর সংযম ছিল অবিচলিত, কর্তব্য-পালনে তখনো তিনি ছিলেন সতত নিরত।

ব্রজবিহারী বর্মণ

ব্রজবিহারী বর্মণের নাম অনেক বুদ্ধিজীবী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তিনি আর নেই—দীর্ঘকাল রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে চিরবিদায় নিয়েছেন। এদেশে যাঁরা নিজের উদ্যোগে মার্কস্‌বাদের প্রচারোদ্দেশ্যে মার্কস্‌বাদী সাহিত্য-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ব্রজবিহারী বর্মণ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বর্মণ পাব্‌লিশিং হাউস্ সে কর্মের একটি প্রথম প্রতিষ্ঠান। তাঁর না ছিল প্রয়োজনানুরূপ অর্থ, না ছিল সহায়; ব্রজবিহারীবাবুর একক শক্তিই তা সাক্ষী। কাজটা তখনো 'নিরপরাধ' ছিল না—ব্রজবিহারী বর্মণকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, বিনাবিচারে বন্দী থাকতে হয়েছে। কঠিন পীড়ায় তিনি পঙ্গু হয়ে পড়লেন, স্বভাবতই কাজ দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। মৃত্যু পর্যন্ত যিনি অপরাজেয় রইলেন তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা শুধু কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাই জানাতে পারি।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৬৮ বৎসর বয়সে আমাদের পরম সুহৃদ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত আজ (৫-৩-৬১) অকস্মাৎ আমাদের ত্যাগ করে যাবেন, একথা কালও ভাবতে পারি নি। বয়সের ভার তাঁকে স্পর্শ করে নি। জরা নয়, গাম্ভীর্যও নয়। পরিহাস-সরস এই অগ্রজের তির্যক হাসি, স্নিগ্ধ সৌহার্দ্য মানব-চরিত্র দর্শনের ও উপভোগের শক্তি—এসব এখনো যেন চোখে ভাসছে।

রঙ্গপুর ন্যাশনাল স্কুল থেকে তিনি পড়তে এসেছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদে। শিক্ষা গ্রহণ শেষ হয় নি, কারণ তখন সে কলেজের শেষ-দশা। শিখলেন সাংবাদিকতা এবং নিজের চেষ্টায় ও রুচিতে নাটক রচনা। তৃতীয় দশকে 'বিজলী' 'বাঙলার কথা'র তিনি সম্পাদক ছিলেন। তখনো সাংবাদিকতা প্রায় দারিদ্র্যের নামান্তর ছিল। জাতীয় আন্দোলনের বহু মহলেও নাটকের নেশা অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করত না। শচীনদা'র সঙ্গে মান্যগণ্যদের সংঘর্ষ আরও বাধত। কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল—তখনো সাংবাদিকরা পোষমানা জীব হত না। আর নেশাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবার মতো সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ও তাঁর ছিল। 'গৈরিক পতাকা',

'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি প্রায় ৪০ খানি নাটকের তিনি নাট্যকার। নাট্য-প্রগতি আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। শান্তি আন্দোলনের একজন প্রধান প্রতিভূ। সোভিয়েত ও চীন প্রভৃতি বহু দেশে তাঁর সমাদর দেখেছি। অথচ তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। বিদেশে তাঁর সাহচর্য ও সহৃদয়তা লাভে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যেরূপ কৃতজ্ঞ হয়েছি, স্বদেশে তাঁর সহায়তা ও অকৃত্রিম উপদেশ-লাভে তেমনি উপকৃত হয়েছেন নাট্য-আন্দোলনের ও শান্তি আন্দোলনের কর্মীরা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়—আমরা আর তাঁকে পাব না।

'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ ?'

খুন করলে মানুষ মরে। প্যাট্রিস লুমুম্বা নিহত হয়েছেন ; কিন্তু মরেছেন বলা অসম্ভব। হলে বুঝতে হবে আফ্রিকা এখনো জন্মে নি। আমাদের মনে হয়—তার জন্ম শুধু নয়, আমরা তার প্রাণের দুর্দমনীয় প্রকাশেরও পরিচয় পাচ্ছি। না হলে নানা দেশের আফ্রিকেয় যুবকের দল কারও ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করে এমন করে বেলজিয়ান দূতাবাসগুলোর বিরুদ্ধে ছুটে গেল কি করে ?

সাম্রাজ্যবাদের 'ক্ষমতা হস্তান্তর' কী চমৎকার চক্রান্ত তা কঙ্গোতে খুব পরিষ্কার। আরও দু-একটি আফ্রিকেয় রাজ্যেও তা প্রচ্ছন্ন। এরূপই পরিষ্কার দেখা যায় মার্কিন-সংযুক্ত-রাষ্ট্র চালিত রাষ্ট্রসংঘের সংকট। সে সংকটে পঞ্চশীলাগ্রহী ভারত-রাষ্ট্র আজ ঘানা প্রভৃতি তার অনুজ গোষ্ঠীর সহযোগী হতে পারছে না, এইটাও লজ্জার কথা। কঙ্গোর স্বাধীনতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন হতে দিয়ে, তারপর মার্কিন-সম্মতি অনুযায়ী কঙ্গোয় 'পার্লামেন্ট' ডাকিয়ে, 'কনস্টিটিউশন' মানিয়ে, কঙ্গোর "স্বাধীন সরকার" প্রতিষ্ঠা করিয়ে আমরা যখন পঞ্চশীলের জয় গাইব—তখন চীনের ওজর যতই দেখাই—আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতিদের চক্ষে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তান ও ফর্মোজায় কোনো তফাত থাকবে কি ? মধ্যপ্রাচ্যে কি কেউ আমাদের বিশ্বাস করবে ? না, বর্মা-সিংহল-ইন্দোনেশিয়া কেউ রাখবে আমাদের পঞ্চশীল-প্রেমে আস্থা ?

আমরা কি মানুষের ভবিষ্যতে আস্থা হারাচ্ছি ? না, মনে করছি মার্কিন-ব্রিটিশ-জোটের পিছনে পিছনে একদিন গিয়ে আফ্রিকার কাছে এই বলাই হবে যথেষ্ট 'ক্ষমা করো।' সেদিন আফ্রিকাও প্রশ্ন করতে পারবে আমাদের কবিকে—'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ ?'

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বিদ্রোহ

৮৮ বৎসরের বৃদ্ধ বার্ট্রাণ্ড রাসেল যখন আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে একা অভিযান করে যাচ্ছেন তখন ব্রিটিশ প্যাট্রিয়টিক ইয়ুথ্‌রা তাঁকে লাঞ্ছিত করে পেট্রিয়টিজম্‌-এর পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল। সব দেশেই কিছু ছেলেকে ক্ষেপিয়ে এরূপ কাজ করানো যায়, সব দেশেই যেমন তামাসার জোর আয়োজন করলে যে কোনো রানীকে দেখবার জন্য মেয়ে-পুরুষকে জড়ো করা সম্ভব। মানুষের সম্বন্ধে তাই অধৈর্য প্রকাশ—অহেতুক না হলেও—নিরর্থক। পেট্রিয়টিজম্‌-এর দুলালদের সম্বন্ধে তাই ঔদাসীন্যই শোভন। কিন্তু যে সংবাদ প্রতিষ্ঠান এ সংবাদ পরিবেশন করে, আর যে সংবাদপত্র এ সংবাদ নিরাবেগচিত্তে এ দেশের পাঠককে পরিবেশন করে, তারা কী ?

হয়তো বৃদ্ধ রাসেল মানুষের সুবুদ্ধিতে এখনো আস্থা রাখেন, না হলে এ প্রতিবাদ তাঁর কার কাছে ? অন্তত আমরা তা রাখি—রাখতে চাই। চাই বলেই ভাবি এসব সমাজে চেষ্টার মধ্য দিয়েই সে সুবুদ্ধি জাগ্রত হচ্ছে—আল্‌ডারমেস্টনের সত্যাগ্রহ, ফার্থে পোলারিস-এর ঘাঁটি বন্ধের চেষ্টা কিংবা রাসেলের একক চেষ্টাকেও তাই ম্যাকমিলান গেট্‌স্কেলদের রাজনীতির থেকে খাটো মনে করি কি করে ? করলে ১৯১৯-এ চেমস্‌ফোর্ডের নিকট লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রকেও ব্যর্থ মনে করতাম ; ১৯৪১-এর 'সভ্যতার সংকটকেও' মনে করতাম ফ্যাশিজমের দৃপ্ত মহিমার সম্মুখে পরাধীন দেশের বৃদ্ধ কবির হাস্যকর কাণ্ড ! ইতিহাস তো বলে—মিলিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের দর্প, ফ্যাশিজমের দম্ভ।

মানুষকে জাগ্রত করাই শুধু নয়, মানুষকে সংহত করাও প্রয়োজন। দেশে-দেশে অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে মানুষের যে সুস্থ চেতনা, কেন্দ্রাভাবে তা বাক্যহারা ; তাকেই করা দরকার স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধকামীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রিত। এজন্য নয়া-দিল্লীতে আগামী ২৪শে—৩০শে মার্চ বিশ্বশান্তি আন্দোলনের যে অধিবেশন হচ্ছে আমরা তাঁকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন—পৃথিবীতে রাসেল বা রবীন্দ্রনাথরা একা নন ; যুদ্ধবাদীরাই দুর্বল।

শতবার্ষিকী

নয়া-দিল্লীর শান্তি-সম্মেলনের একটি দিন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর আলোচনা বসবে। আর তখনি কলকাতায় অনুষ্ঠেয় (নবেম্বরে) 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী শান্তি

উৎসবের' কার্যক্রমাদি আলোচিত ও স্থিরীকৃত হবে। অবশ্য তার জন্য সাহায্য অনেক প্রয়োজন—সেজন্য আবেদন করা হচ্ছে।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব যথা-প্রত্যাশিত বাঙলা দেশে আরম্ভ হয়েছে। শীঘ্রই তা চলবে পূর্ণোদ্যমে। সকল প্রতিষ্ঠানের সকল অনুষ্ঠানের আমরা সাফল্য কামনা করি ; তা আর না বললেও চলে।

কিন্তু এ বৎসরটি আরও অনেক শতবার্ষিকী উৎসবের বৎসর। মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন শত বৎসর পূর্বে। তা কি স্মরণীয় নয়? অন্তত বাঙালী সাহিত্যিকরা তা স্মরণ করবেন—যেমন তাঁরা সনেট-এর শতবার্ষিকীও স্মরণ করেছেন।

আরও বড় কথা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েরও এ বৎসর শতবার্ষিকী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েরও শতবার্ষিকী। দু-জনাই স্মরণীয়—বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধবের মতো পুরুষের সম্বন্ধে একালের যুবকেরা প্রায় অজ্ঞ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অবশ্য দেশ অত শীঘ্র বিস্মৃত হবে না। তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজনও হচ্ছে। আমরা আশা করব—বাঙালী মনে রাখবে বাস্তববাদী এই সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপককে ; বিজ্ঞানী-গোষ্ঠীর গুরুকে ; দেশপ্রেমিককে, মহাপ্রাণ মানুষকে। আচার্য তো শুধু অধ্যাপক ছিলেন না। ছিলেন একটা ইন্স্টিটিউশন ; স্বয়ংই একটা জাতীয় ঐতিহ্য!

গোপাল হালদার

চিত্রপ্রদর্শনী : কিরণ সিংহ

কিছুদিন আগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ ভবনে শিল্পী কিরণ সিংহের ছবির যে-প্রদর্শনীটি হয়ে গেল, সেটা সাম্প্রতিক কলকাতার নিত্য নতুন চিত্র-প্রদর্শনীর ভীড়ের মধ্যেও বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। খবরের কাগজের পেশাদার কলাসমালোচকরা—যে-কোনো কারণেই হোক—এই প্রদর্শনীটি সম্পর্কে চিত্ররসিক-সাধারণকে কিছু জানানো দরকার বলে মনে করেন নি। ফলে, এই প্রবীণ ও শক্তিমান শিল্পীর ছবির মেলায় যে-রকম দর্শকসমাবেশ হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। চিত্রকলার যে বাস্তবধর্মী স্বপ্ন ও রোম্যান্টিক আদর্শটি আজ ক্রমেই অপস্রিয়মান, কিরণ সিংহের ছবিগুলি সেই আদর্শেই উজ্জীবিত।

কিরণ সিংহ অনেকদিনের শান্তিনিকেতনবাসী—যদিও সেখানকার কলাভবনের সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। ইতিপূর্বে দিল্লীতে ও ভারতের বাইরে অন্যান্য স্থানে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। সম্প্রতি এখানে তাঁর ১৯টি ছবির যে-প্রদর্শনী হয়ে গেল, সেটা সম্ভবত কলকাতায় তাঁর প্রথম অথবা দীর্ঘকাল পরে অনুষ্ঠিত একক-প্রদর্শনী।

কিরণ সিংহ তাঁর এই প্রদর্শনীর নাম দিয়েছেন "সাগা অফ দি সান্তালস্"—সাঁওতালদের জীবনগাথা। বীরভূমের—বিশেষত শান্তিনিকেতনের আশে-পাশের সাঁওতালপল্লীর প্রকৃতিলালিত মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবনকে তিনি চিত্রিত করেছেন গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। ক্ষেতে ধানবোনার কাজে রত সাঁওতাল মেয়েদের বলিষ্ঠ সুন্দর দেহভঙ্গী ; সারা দিনের কাজের শেষে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে তাদের ঘরে ফেরা ; উৎসবে পরবে বাঁশির সুরে বাঁধা তাদের যৌথনৃত্য ; কোপাই নদীতে সাঁওতাল কিশোরীদের স্নানের আনন্দ, ইত্যাদি অপূর্ব উজ্জ্বল রঙে চিত্রায়িত হয়েছে এই ছবিগুলিতে। এই উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বিপরীত টোন-এর সার্থক প্রয়োগে তাঁর ছবির ফিগারগুলি আশ্চর্যরকমের এক প্ল্যাস্টিক গুণ অর্জন করেছে। অধিকাংশ ছবিতেই সাঁওতাল নারী-পুরুষরা এত জীবন্ত যে তাদের যেন হাত বাড়ালেই ধরাছোঁয়ার নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। বর্ণ বিশ্লেষণে এবং রঙের প্রতিপূরণে কিরণ সিংহের আশ্চর্য দক্ষতা যে-কোনো চিত্রদর্শককে মুগ্ধ করবে। তাঁর এই রচনাগুলি হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে গগ্যাঁর—কিংবা, বিশেষত জর্জেস সিউর‍্যাটের ছবিগুলির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই আপাত মিলটুকু নিতান্তই বাহ্যিক। কিরণ সিংহ তাঁর ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে সমীকৃত করেছেন যার ফলে তাঁর ছবিগুলি শিল্পীর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধরনের একটি শিল্প আস্বাদ অর্জন করেছে।

কলকাতায় আজকাল সারা বছর জুড়ে একই সঙ্গে একাধিক চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এটা ভালো কথা, কারণ দর্শক-সাধারণ যত বেশি ছবি দেখবেন ততোই তাঁদের ছবি দেখার চোখ খুলবে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এই সব প্রদর্শনীর অনেকগুলিতেই আর্টের নামে ভয়ানক রকম ভেজাল চলে। মার্কিন ট্যুরিস্ট আর বিদেশের রাষ্ট্রদূতাবাসের কাল্‌চারাল অ্যাটাশেদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব দিল্লী-বোম্বাইয়ের একদল শিল্পীর সঙ্গে ইদানিং কলকাতার কিছু শিল্পীও কিম্ভূত মডার্নিজম্-এর ঘোষণায় সুর

মিলিয়েছেন। মুরুব্বীদের মন-জোগানো কলাকৈবল্যের এই ভীড়ে, কিন্তু সিংহের এই বলিষ্ঠ ও বস্তুমুখী রোম্যান্টিসিজম্ আমাদের কাছে তাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

রবীন্দ্র মজুমদার

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ : 'মানিক'

গোড়ার যুগে ফিল্মে কাজ করে যাঁরা আজও স্মরণীয় ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথস তাঁদের অন্যতম। বিখ্যাত সোভিয়েত পরিচালক সার্গেই আইজেনস্টাইন তাঁর এক বিরাট প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, গ্রিফিথসের কাছে রুশ চলচ্চিত্রশিল্প যতটা ঋণী, ডিকেন্সের কাছে গ্রিফিথস ততটাই ঋণী (ফিল্ম ফর্ম : পৃঃ ২৩৩)। ফিল্মের গোড়ার যুগে Oliver Twist, Enoch Arden (টেনিসন) এর ফিল্মরূপ দিয়েছেন গ্রিফিথস্। আজ বাংলা ফিল্মের সোনার যুগে 'মানিক' দেখে সে কথাটা মনে পড়ে।

অলিভার টুইস্ট অবলম্বনে ফিল্ম করার চেষ্টার জন্য চলচ্চিত্র প্রয়াস-সংস্থা প্রশংসার দাবি রাখে। এককালের সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ, তারাশঙ্কর কিংবা রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত জমকালো উপন্যাসের চিত্ররূপের বাজারে 'মানিক' প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিফিথস্ কিংবা অ্যালেক গিনিসের সৃষ্টির কথাও মনে পড়ে যায়।

এই দ্বিধার মধ্যে 'মানিক' দেখতে গিয়েছিলাম। মোটামুটি চলনসই ফিল্মেও চূড়ান্ত ভালোমন্দ বিচার রুচিনির্ভর জেনেও সমালোচনা করছি।

মানিকে দুচারটি দৃশ্য আছে খুবই ভাল। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে ফিল্মের অন্ততঃ একটা পরোক্ষ যোগ আছে বলে মনে হয় কিন্তু তার প্রথম বক্তৃতাটি ছাড়া আর কোন বক্তব্য তাঁর চরিত্রে পাওয়া ভার। ঝড়ের রাতে মানিকের মার 'বরদাসুন্দরী অনাথ আশ্রমে' আশ্রয় নেওয়ার দৃশ্যটি হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য। পরে মৃত বালকের চোখের তারা নড়ায় একটি ভাল দৃশ্য মাটি হয়েছে। মানিকের ধাত্রীমাতা কখনই বিশ্বাস্য রকম অভিনয় করতে পারেন নি। এ বাদে প্রথমাংশের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে শ্মশানে একলা ঘরে মানিকের ভয়, মানিকের ছোট্ট রোগা বন্ধুটি ও দুটি গান প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয়ার্ধে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের অতি অভিনয়, শম্ভু মিত্রের গানটি বেশ খারাপ লাগে। তৃপ্তি মিত্রের একটি হাঁস কাটার দৃশ্য, অমর গাঙ্গুলীর

অভিনয়, একটি ঝুলন্ত ফাঁস দেওয়া দড়ির ব্যবহার ও নীলী (তৃপ্তি মিত্র-র) খুনের পরের দৃশ্যটি ভাল। পাহাড়ী সান্যালের চরিত্রটি প্রশংসনীয়ভাবে স্পষ্ট।

এ সমস্ত বাদে মানিকের শেষের দিকে অমর গাঙ্গুলীকে পুলিশের কুকুর (লাকি) দিয়ে ধরার একটি সুসম্পাদিত অংশ আছে। ফিল্ম জিনিসটার জাতগুণে এই ঘটনাটি এতই মারাত্মকভাবে মনকে অধিকার করে যে এই অংশে শুধু যে ডিকেন্সের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া কঠিন তা নয় এ অংশে এই ফিল্মেরই পূর্বের প্রশংসনীয় যা কিছু বক্তব্য ছিল তারও ভরাডুবি হয়েছে। আছে শুধু ক্রাইম সাসপেন্সের ঘূর্ণী। শেষের ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে তৃণাঞ্জন মিত্রের মিলনদৃশ্য তাকে উদ্ধার করতে পারে কিনা সন্দেহ।

আমার পাশের এক সাধারণ দর্শক এই তাড়া করার দৃশ্যে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন 'লোকটাকে ধরে ফেললো যে!' তাতে আমি স্পষ্ট বুঝলাম দৃশ্যটিতে cross-cutting কতখানি সফল। কিন্তু তিনিই ফিল্ম শেষ হতে বললেন 'এই কুকুরের কত দাম! মানুষের চেয়েও বেশি!'

তখন বুঝলাম effective chase sequence কি রকম করে অলিভার টুইস্টকে ডিটেকটিভ বইয়ে পরিণত করতে পারে, যাতে মানুষের মনে হয় সমাজের কাছে মানুষের চেয়ে শিক্ষিত ডিটেকটিভ কুকুরের দাম বেশি।

জিষ্ণু দে

৭চৈত্র

১৩৬৭

পরিচয়

